ভেতরে

এই সংখ্যা ছয় পাতার

মোদী সরকার ঃ প্রাথমিক প্রবণতা ও সংকেত ... ২

লোকসভা নির্বাচন ঃ সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটির পর্যালোচনা ... ৩

শ্রদ্ধাঞ্জলি ... ৫

আজকের দেশব্রতী

₹ ১.৫০

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২১ সংখ্যা ১৬ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ৫ জুন ২০১৪

২০১৪-র রায় গণতন্ত্রের রক্ষকদের সামনে যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এল

।। দীপঙ্কর ভট্টাচার্য।।

২০১৪-র রায় ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসে সবথেকে স্তম্ভিতকারী ফলাফলগুলোর অন্যতম রূপেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ভারত এতদিনের মধ্যে সবচেয়ে কট্টর দক্ষিণপন্থী সরকারকে ক্ষমতায় এনেছে, যে সরকারের সংখ্যাগুরুবাদী বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই এবং সমস্ত জনমত ও বুথ ফেরত সমীক্ষাকে ছাপিয়ে গিয়ে এবারের রায় বিজেপিকে এককভাবে নিরঙ্কুশ ও স্বস্তিদায়ক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েছে, বিজেপির মিত্ররা নতুন সরকারে একটু বেশি শক্তি জুগিয়েছে মাত্র।

এবারের মত একতরফা রায় শেষবার দেখা গিয়েছিল ১৯৮৪ সালে, যখন কংগ্রেস অভূতপূর্বভাবে ৪০০-রও বেশি আসনবিশিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং বিজেপিকে ২টি আসন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ঐ অস্বাভাবিক রায় এসেছিল ইন্দিরা গান্ধি হত্যা এবং তারপর ঘটা শিখ বিরোধী দাঙ্গার পরিণতিতে। আর বিজেপি আগ্রাসি জাতীয়তাবাদের তার নিজ ভূমিতে সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়েছিল। এবার বিজেপিই ২৮০-র বেশি আসন পেয়ে ব্যাপকভাবে বিজয়ী হয়েছে এবং কংগ্রেসের আসন সংখ্যা সর্বকালের মধ্যে সবচেয়ে কমে দাঁড়িয়েছে ৪৪টি আসনে।

রাজীব গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস যদি ১৯৮৪-র সহানুভূতি হাওয়ার ওপর ভর করে বিজয়ী হয়ে থাকে, এবার নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপি জনরোষের ভোট তাদের ঝুলিতে ভরেছে, অবশ্য ঐ রোষের সঙ্গে 'সুদিন' যুগের সূচনার আশা ও প্রতিশ্রুতির মিশেলও ছিল। আজ পর্যন্ত কোন সরকারই খুব সম্ভবত এমন গণরোষের জন্ম দেয়নি যা ইউ পি এ গত পাঁচ বছরে সৃষ্টি করেছে। এই দিক থেকে ২০১৪-র রায়ের সঙ্গে ১৯৭৭-এর রায়ের কিছু মিল রয়েছে যখন দক্ষিণের রাজ্যগুলো ছাড়া ভারতের ব্যাপক অংশ ইন্দিরা গান্ধির স্বৈর জমানা থেকে নিষ্কৃতির একক লক্ষ্যেই ভোট দিয়েছিল এবং সেই প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রে প্রথম অকংগ্রেসি সরকারকে এনেছিল।

দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফারাক অবশ্য রয়েছে ঃ (ক) ১৯৭৭ সালে দক্ষিণের রাজ্যগুলো কংগ্রেসের পাশেই ছিল, এবার কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান প্রায় পুরোমাত্রায় এবং বলতে গেলে সারা ভারত জুড়ে (কেরল, মণিপুর ও মিজোরাম ছাড়া অন্য কোন রাজ্যে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়নি) এবং (খ) ১৯৭৭ সালে যেখানে কংগ্রেসের বিকল্প সরকার আত্মপ্রকাশ করেছিল নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে, ২০১৪ সালে সেখানে সুযোগকে দুহাতে আঁকড়ে ধরার জন্যে বিজেপি পুরোপুরি তৈরি ছিল।

চূড়ান্তরূপে সফল বিজেপির নির্বাচনী রণনীতি ও প্রচারের নকশার উপাদানগুলো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। প্রায় নিষ্ক্রিয় ইউ পি এ সরকারকে হঠানোর জন্য প্রবল মনোভাব জাতীয় স্তরে বিরাজ করেছিল—একদিকে কর্পোরেট ভারত যখন 'নীতি পঙ্গুত্ব'র বিরুদ্ধে গলা ফাটাচ্ছিল এবং "দৃঢ় নেতৃত্ব"র পক্ষে সওয়াল করছিল সাধারণ জনগণ তখন দুর্নীতি ও আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি থেকে মুক্তি চাইছিলেন। সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত এইভাবে বিজেপির পক্ষে অনুকূল হয়ে উঠেছিল এবং দিল্লীতে আপ সরকার পদত্যাগ করার পরপরই আধিপত্যকারী কর্পোরেট প্রচার ও সংবাদ মাধ্যম নিজেদের ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে মোদী বিপণন প্রকল্পের প্রতিভূ করে তুলল। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমের মধ্যে দিয়েই হোক বা মাটিতেই হোক, কর্পোরেট ভারত বিজেপির প্রচারে দুহাতে টাকা ঢেলেছে এবং ধনকুবের আর সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমের ক্ষমতা এর আগের কোন নির্বাচনে এমন তীব্রভাবে ধরা পড়েনি।

প্রচারে সাম্প্রদায়িক দিকটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একথা ঠিকই যে, বিজেপি রাম মন্দির এজেণ্ডার ওপর সেরকম জোর দেয়নি যেমনটা তারা দিয়েছিল আদবানীর রথযাত্রার সময় এবং ১৯৮০-র দশকের শেষে ও ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার নির্বাচনে। সেটা করার তার দরকারও ছিল না, কেননা মুসলিম-বিরোধী বিদ্বেষ উসকিয়ে তোলার আরও অনেক ব্যঞ্জনাময় পন্থা তার ছিল। 'সংখ্যালঘু তোষণ', 'ভোট-ব্যাঙ্ক রাজনীতি', 'প্রেম জেহাদ', 'গোলাপি বিপ্লব', 'পাক-প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসবাদ', 'বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ', 'অবৈধ বাংলাদেশী অভিবাসীদের জায়গা করে দেওয়ার জন্য চক্রান্তমূলকভাবে গণ্ডার হত্যা' ইত্যাদি নিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্বেষমূলক প্রচার বিজেপির উদ্দেশ্যকে অত্যন্ত সফলভাবেই চরিতার্থ করেছে। আমরা কি করে ভুলে যেতে পারি মুজফফরনগরের দাঙ্গার কথা যা অত্যন্ত কাঙ্খিত পথে বিজেপির নির্বাচনী প্রচারের সূচনা ঘটিয়েছিল, কিংবা ভুলে যেতে পারি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার শেষ দিকে ঘটা বাকসা-কোকরাঝাড়ের গণহত্যার কথা,

চারের পাতায় দেখুন

হিন্দমোটর, জেশপ, ডানলপ, ডাকব্যাক ... বন্ধ হচ্ছে একের পর এক কলকারখানা

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের উদ্যোগে কলকাতায় কনভেনশন

পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ১২ জুলাই কমিটি ও ফেডারেশনগুলোর উদ্যোগে হিন্দমোটর, জেশপ, ডানলপ, ডাকব্যাক সহ রাজ্যের বন্ধ হয়ে যাওয়া সমস্ত কারখানা ও চা বাগানগুলো খোলার দাবিতে ৩ জুন ২০১৪ সুবর্ণ বণিক হলে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনের প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয় যে, বর্তমানে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারী কর্মহীন হয়ে পড়েছেন, অনেকে কর্মহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। মালিকরা নিয়মিত শ্রমিকদের বেতন দিচ্ছেন না। শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হচ্ছে। স্থায়ী কাজে, অস্থায়ী শ্রমিক নিযুক্ত করা হচ্ছে। আবার কনট্রাক্ট লেবার আইন অনুযায়ী সমকাজে সমবেতন সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হচ্ছে না। শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ই এস আই, গ্র্যাচুইটির টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে। শ্রম আইন মানা হচ্ছে না। অথচ রাজ্যের শাসক দলের লোকেরা মালিকদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মদত দিচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের শ্রমদপ্তর নীরব। রাজ্য সরকার স্পষ্টতই প্রায় সবক্ষেত্রেই মালিকদের পক্ষ অবলম্বন করছেন। কার্যত সমগ্র দেশ সহ রাজ্যের শ্রমিক শ্রেণীর সামনে এক কঠিন পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। হিন্দ মোটর কারখানার ২৩০০ কর্মী গত ছয় মাস বেতন পাচ্ছেন না। ২৪ মে কারখানায় সাসপেনশন অব ওয়ার্কসের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। গত ২৮ মে হিন্দুস্থান মোটর কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে রাজ্য সরকারের পক্ষে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন হিন্দ মোটরের বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্রমিকদের এককালীন মাথাপিছু সামান্য কিছু অর্থ দেওয়া হবে। কারখানাটি খোলার জন্য রাজ্য সরকারের কোন ভূমিকা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। এক সময়ে কোম্পানীর পক্ষ থেকে আরও দুটি নতুন গাড়ি বাজারে আনার কথাও বলা হয়েছিল। হিন্দুস্থান মোটরের পুনরুজ্জীবনের জন্যে জম বিক্রি করে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় না করে কর্তৃপক্ষ বর্তমানে কাঁচা মালের মূল্যবৃদ্ধি, গাড়ী পিছু উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, মূলধন ও ক্যাশ ফ্লো কম সহ বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে কারখানা না চালানোর কথা বলছেন। শোনা যাচ্ছে গত ফেব্রুয়ারী মাসে কারখানাটিকে রুগ্ন সংস্থা হিসাবে ঘোষণার জন্যে বি আই এফ আর-এর কাছে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সাথে কোন আলোচনা করা হচ্ছে না।

জেশপ কারখানা ১৫ মে নির্বাচনের অব্যবহিত পর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। জেশপের শ্রমিকরা গত ৭ মাস বেতনহীন অবস্থায় সাসপেনশন অব ওয়ার্কসের খাঁড়া মাথায় নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কারখানার গেটে অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে উৎপাদন বন্ধ, সমাজবিরোধীরা কারখানার মেশিন ও যন্ত্রপাতি খুলে নিয়ে যাচ্ছে, কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসন নীরব। শ্রমিকরা বারবার থানায় ও প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও কোন কাজ হচ্ছে না। কার্যত এই শিল্পটি স্থায়ীভাবে পঙ্গুত্বে পরিণত করতে গভীর চক্রান্ত চলছে। সম্প্রতি কাগজে প্রকাশিত হয়েছে রাজ্যের মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মালিককে বলেছেন কারখানা বন্ধ করে জমি ফেরত দিয়ে চলে যান। মালিকও তাই চাইছে।

২০০৯ সালে দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের রেলমন্ত্রী হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন রেলদপ্তর জেশপ কারাখানাটি অধিগ্রহণ করবে। কিন্তু কিছুই হয়নি। এখনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিছুই করছেন না। একইভাবে ডানলপ কারখানাটিও দীর্ঘদিন বন্ধ। সাত বছর হয়ে গেল, বার বার খুলবে বলেও কিছু হচ্ছে না। ডাকব্যাকে গত ৩৪ মাস বেতন বন্ধ। শ্রমিকদের মাইনেও হচ্ছে না। শ্রমিকদের ভি আর এস দেওয়া হচ্ছে। টেক্সমেকো-তেও একবছর উৎপাদন বন্ধ, শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছে না। দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চলে এম এ এম সি, হিন্দুস্থান কেবল্‌স্‌, বার্ণ স্ট্যাণ্ডার্ড দীর্ঘদিন বন্ধ। উত্তর ২৪ পরগণার ইনচেক টায়ার সহ বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাগুলোতে বহু ছোট ও মাঝারি শিল্প বন্ধ।

রাজ্যের বেশিরভাগ চটকলে শ্রমিকরা পুরো কাজ পাচ্ছে না, ৪ দিন বা ৫ দিনের সপ্তাহ চালু করা হয়েছে। চা বাগানের শ্রমিকরা কর্মচ্যুত হচ্ছে, আত্মহত্যা করছে, বেশ কয়েকটি চা বাগান বন্ধ। টি-প্ল্যান্টেশন লেবার অ্যাক্ট ও টি-অ্যাক্ট অনুযায়ী স্ট্যাটুইটারী বেনিফিট, ন্যূনতম মজুরিও শ্রমিকরা পাচ্ছে না। পরিবর্তনশীল সূচক সাপেক্ষে ডি এ প্রদান পদ্ধতি মালিকরা মানছে না। কার্যত মালিকরা কোন শ্রম আইনই মানছেন না। একইভাবে শাসকদল ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী মনোভাব মালিকদের শ্রম আইন ভাঙতে উৎসাহিত করে চলেছে। আসলে গত প্রায় আড়াই দশক ধরে উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের যে পথ কেন্দ্রীয় সরকার দেশে এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যের সরকার অনুসরণ করেছে—বর্তমান রাজ্য সরকারও একই নীতি অনুসরণ করছে, যা শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী। রাজ্যের রাষ্ট্রায়ত্ত পরিবহণ শিল্পের শ্রমিকেরা চরম বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন-সংগ্রাম করেও রাজ্য সরকারের নেতিবাচক ভূমিকায় অবহেলিত হয়েছেন। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন এন ডি এ সরকার তৎপরতার সঙ্গে ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ, প্রতিরক্ষায় বিদেশী বিনিয়োগ উন্মুক্ত করার পথে এগোচ্ছে।

পাঁচের পাতায় দেখুন

মোদী সরকার ঃ প্রাথমিক প্রবণতা ও সংকেত

বিজেপি তথা মোদী সরকার তার শপথ গ্রহণের পর্ব থেকে কোন সংকেতগুলো পাঠাতে শুরু করেছে? যদিও মোদী নিজেকে মজদুর নম্বর এক বলে দাবি করছেন, তার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে কিন্তু 'মালিক'রাই বেশি করে নজরে এসেছেন। কর্পোরেট জগতের রথী-মহারথীরা সেখানে সদলে হাজির ছিলেন। আম্বানি, আদানি, হিন্দুজা প্রমুখ যাদের অন্যতম।

বিদেশী অতিথিদের আমন্ত্রণের দিকে এবার আসা যাক। এই আমন্ত্রণের মধ্যে কিন্তু সুচিন্তিত বিদেশ নীতির ছাপ তেমন নেই। আছে মোদীর আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিচিতি বাড়ানোর একটা প্রয়াস। নিমন্ত্রিতদের যে তালিকা তা নিয়ে ইতিমধ্যেই ভালোরকম প্রশ্ন উঠে গেছে। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি মহিন্দ্রা রাজাপক্ষ আমন্ত্রিত ছিলেন। এই আমন্ত্রণ নিয়ে বিভিন্ন মহলে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে তামিলনাড়ুর জনগণ এ নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। যুদ্ধাপরাধে অপরাধী রাজাপক্ষে শ্রীলঙ্কায় সংখ্যাগুরুর একাধিপত্যর প্রকাশ ও তামিল জনগণের ধ্বংসসাধনের অপরাধে অপরাধী হয়ে আছেন। প্রশ্ন আরও আছে। সার্ক দেশগুলোর বাইরে নিমন্ত্রিত হলেন সার্কের 'আমন্ত্রিত সদস্য' দেশ মরিশাসের রাষ্ট্রপ্রধান। কিন্তু সার্কের অন্যান্য 'আমন্ত্রিত সদস্য' দেশ, মায়ানমার ও চীনকে আমন্ত্রণ জানানো হল না কেন?

মোদীর ছোট্ট সরকারের শ্লোগানের আসল মানে হল প্রধান কয়েকজন মন্ত্রী ও প্রধান কিছু সিদ্ধান্তের ঘনীভূত হওয়ার এক প্রক্রিয়া। আসলে এটা একটা অতি ক্ষমতাশালী প্রধানমন্ত্রী অফিস ও অতি ক্ষমতাশালী মন্ত্রী পরিষদ গড়ে তুলবে। অর্থ দপ্তর ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রককে সংযুক্ত করার মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে সরকারের অর্থনৈতিক নীতি রচিত হবে মূলত কর্পোরেট স্বার্থকে মাথায় রেখেই।

মোদী ভেবেচিন্তেই মুজফফরনগর দাঙ্গায় অভিযুক্ত সঞ্জীব বালিয়াকে মন্ত্রী করেছেন। এর পেছনে সক্রিয় রয়েছে সংখ্যাগুরুর আধিপত্যবাদী মানসিকতা এবং দাঙ্গায় অভিযুক্তকে তার শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখার প্রক্রিয়া। আমাদের মনে পড়তে পারে একইভাবে মোদী তার মন্ত্রীসভায় ২০০২-এর গুজরাট দাঙ্গায় অভিযুক্ত মায়া কোদানিকে স্থান দিয়েছিলেন এবং একমাত্র আদালতের রায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরেই তাকে সরানো হয়েছিল।

উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান ভি কে সিং-এর নিয়োগ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই নিয়োগ আফস্পার মতো দানবীয় আইনকে অপসারণের দাবিকে শুধু ব্যঙ্গই করছে না, এটাও বোঝা যাচ্ছে মোদী সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতকে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখবে।

অনেক নবনিযুক্ত মন্ত্রীর নানা বক্তব্যেই যথেষ্ট বিপদ সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী নাজমা হেপতুল্লা বলেছেন প্রকৃত সংখ্যালঘু হিসেবে মুসলিমরা ঠিক বিবেচনাযোগ্য নন, কারণ তাদের সংখ্যা এদেশে যথেষ্টই। বরং পার্শী সম্প্রদায়কে বলা যায় সত্যিকারের সংখ্যালঘু এবং সরকারকে সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের দিকেই আগে তাকাতে হবে। প্রকৃত তথ্য হল এদেশে মুসলিম ও খ্রীষ্টানরা বঞ্চনা ও নানাবিধ আগ্রাসনের বর্শামুখ হিসেবে সবচেয়ে সামনের সারিতে আছেন। ভারতে মুসলিমরাই অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া এবং সামাজিকভাবে সবচেয়ে বঞ্চিত। অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে পার্শীদের দাঁড় করানোর চেষ্টা এবং মুসলিমরা প্রকৃতপক্ষে সরকারি সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য নন এই ভাষ্য সামনে আসা মোদী সরকারের সংখ্যাগুরুর আধিপত্যবাদী মানসিকতার আর এক নগ্ন প্রকাশ।

প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন মোদী সরকার জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদানকারী ৩৭০ ধারাকে বাতিল করার জন্য পদক্ষেপ করছে। প্রশ্ন এটাই সংসদে কোনও আলোচনা ছাড়া সংবিধানের অন্যতম মৌলিক বিষয় ৩৭০ ধারা বাতিলের বিষয় নিয়ে এগোনোর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর কীভাবে দাবি তুলতে পারে?

মোদীর ব্যক্তিগত নেতৃত্বকেই যেখানে এই সরকারের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে দেখা হচ্ছে সেখানে হেপতুল্লা বা জিতেন্দ্র সিং-এর মন্তব্যকে আলটপকা বলে ধরে নেওয়ার কারণ নেই। এগুলো মোদী সরকারের নীতিমালার ওপর আর এস এস-এর প্রভাবেরই সূচক। মন্ত্রক এবং নীতিমালা নির্ধারণ পর্বে আর এস এস এবং বিজেপি নেতাদের নিয়মিত বৈঠক এই সরকারের ওপর আর এস এস-এর প্রভাবের প্রত্যক্ষ নিদর্শন, আর তাকে আড়াল করার কোন চেষ্টাও নেই।

মোদী সরকার প্রথম দিন থেকেই তার মর্জিমত প্রচলিত আইনকানুনে রদবদলের চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি (ট্রাই)-এর এক প্রাক্তন শীর্ষকর্তাকে বেছে নেওয়ার জন্য ট্রাই-এর চলতি আইনকে উপেক্ষা করা হয়েছে। ট্রাই-এর চলতি আইনে তার কোনও অবসরপ্রাপ্ত শীর্ষকর্তার সরকারি পদ গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। এই নিষেধ প্রকাশ্যে আসায় দ্রুত অর্ডিনান্স জারি করে বদল আনা হয়েছে চলতি ট্রাই আইনে, আর এভাবেই বেআইনি বিষয়টিকে 'আইনসিদ্ধ' করা হয়েছে।

নতুন সরকারের প্রধান শাসক দল তার নিজেদের ও সহযোগী দলগুলোর নেতানেত্রীদের প্রাপ্য শাস্তি থেকে রেহাই দিতে যে যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রয়োগ করবে, তেমন অশুভ ইঙ্গিত মিলতে শুরু করেছে। আর এস এস নেতা ইন্দ্রেশ কুমার মোদীর হয়ে বেনারসে প্রচার চালিয়েছিলেন। এই নেতা অনেকগুলো সন্ত্রাসবাদী বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্ত। মোদীর স্বপক্ষে প্রচারের প্রতিদান হিসেবে তিনি দাবি তুলেছেন আর এস এস-এর লোকেরা যা সব সন্ত্রাসবাদী হামলা সংক্রান্ত মামলায় জড়িয়ে গিয়েছেন সেগুলোর 'পুনর্মূল্যায়ন' করতে হবে। বালিয়াকে মন্ত্রী করে রক্ষাকবচ দেওয়ার মত ঘটনা থেকে স্পষ্ট হচ্ছে মুজফফরনগর দাঙ্গার ঘটনায় জড়িত মূল অভিযুক্তদের মদত দেওয়ার বিষয়টি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার প্রথম বিবৃতিতেই বলেছেন সরকার 'স্নুপগেট' তদন্তের পুনর্বিচার করবে, যে ঘটনায় অমিত শাহ এবং মোদী এক মহিলার ওপর বেআইনি নজরদারির অভিযোগে অভিযুক্ত।

মোদী বিজয়ে উল্লসিত হয়ে লুম্পেন গৈরিক বাহিনী বেশ কিছু জায়গায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। কর্ণাটকে বিজেপির বিজয় মিছিল সংখ্যালঘুদের উত্যক্ত করেছে, মোদীর শপথ গ্রহণের দিন আমেদাবাদে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হয়েছে, পাটনা এ এন সিনহা ইনস্টিটিউট-এ একটি আলোচনা সভার ওপর এ বি ভি পি হামলা চালিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে মোদী বিরোধী মন্তব্যের জন্য বেশ কিছু ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে, ১৪৪ ধারার অজুহাতে দিল্লিতে বেশ কিছু প্রতিবাদ মিছিলের ওপর আগ্রাসন নেমে এসেছে।

প্রধান প্রধান সংবাদমাধ্যমগুলোর পেশাদারি দায়িত্ববোধ পালনে অনীহা আরেকটি উদ্বেগজনক সংকেত। গুজরাট পুলিশ এবং গুজরাট সরকারের তৎকালীন স্বরষ্ট্রমন্ত্রী মোদীকে অক্ষরধাম বিস্ফোরণ মামলায় নিরীহ মানুষকে অভিযুক্ত করার বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট যে রায় বহাল রেখেছে, সে বিষয়ে প্রধান প্রধান সংবাদমাধ্যম আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। মন্ত্রী পরিষদ গঠন নিয়ে সংবাদমাধ্যমের আলোচনাতে দাঙ্গা অভিযুক্তদের মন্ত্রী করার বিষয়টি প্রায় উপেক্ষিতই হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে একজন সচিবকে নিয়োগ করার জন্য একটি বেআইনী বিষয়কে আইনী করার চেষ্টার ঘটনাটিও সেভাবে সামনে আসেনি। স্নুপগেট মামলার অভিযুক্তদের আড়াল করায় সরকারের চেষ্টার দিকটিও অনালোচিত থেকে গেছে।

মোদী সরকার তার যাত্রা সবে শুরু করেছে। তাকে অবশ্যই জনগণের সামনে রাখা প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণে দায়বদ্ধ হতে হবে। মূল্যবৃদ্ধি কমানো, দুর্নীতি রোধ করা, বেকার সমস্যার সমাধান করা, কৃষকদের সংকটের মোকাবিলা করা ও ছাত্রযুবদের অধিকারের প্রশ্নটি এর মধ্যে সামনের সারিতে আছে। প্রধানমন্ত্রী নিজেকে 'মজদুর নং এক' বলেছেন, তাকে অবশ্যই শ্রম আইন এবং শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান নিতে হবে। সাংবিধানিক অধিকারগুলো রক্ষায় তাকে অবশ্যই বিশেষভাবে দায়বদ্ধ হতে হবে। সমস্ত নাগরিকের অধিকার ও স্বাধীনতা যাতে রক্ষিত হয়, বিরোধী মত যাতে আত্মপ্রকাশে বাধাগ্রস্ত না হয়, সংখ্যালঘু, মহিলা ও সমাজের পিছিয়ে পড়া জাতিসমূহের অধিকার যেন সুরক্ষিত থাকে সেটা তাকে নিশ্চিত করতে হবে।

সংসদের ভেতরে বিরোধী স্বরের স্বল্পতা এবং সংবাদমাধ্যমের বড় অংশের স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপ-এর প্রেক্ষিতে রাস্তার আন্দোলনে জনগণের সক্রিয়তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ২ জুন ২০১৪)

সম্পাদকীয়

পরিবর্তনের দাবির মুখে সি পি এম নেতৃত্ব

রাজ্য সি পি এমের মধ্যে নেতৃত্ব পরিবর্তনের দাবি উঠে গেল এবার খোদ রাজ্য স্তরের কিছু নেতাদের পক্ষ থেকে। এটা ঘটেছে দলের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রাজ্য কমিটির বৈঠকে খোদ সর্বোচ্চ নেতৃত্বের উপস্থিতিতেই। যে সমস্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে নেতৃত্ব পরিবর্তনের দাবি তা যেমন রাজ্যের নেতৃত্বের প্রশ্নে, তেমনি তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সর্বোচ্চ নেতৃত্বের উদ্দেশ্যেও প্রচ্ছন্ন বার্তার ইঙ্গিত মিলেছে। বিতর্কের ও ক্ষোভের বিষয়াদির কিছু কিছু যেমন সাম্প্রতিকতম, তেমনি বেশকিছু দীর্ঘমেয়াদীর। ক্ষোভ ফেটে পড়েছে ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে নেতৃত্ব প্রণীত তথাকথিত তৃতীয় ফ্রন্ট বা 'বিকল্প' তৈরীর লাইন চাপিয়ে দেওয়া ও চূড়ান্ত ব্যর্থ হওয়া নিয়ে। তার প্রত্যুত্তরে রাজ্যের ও কেন্দ্রের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কোনও যুক্তিগ্রাহ্য গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়নি। নেতৃত্বকে সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। তবে এই ভুলের খেসারত দিতে হল কেন, এহেন ভুলের বারবার পুনরাবৃত্তি কেন, সেই গভীরে বিতর্ক এখনও অভিমুখী নয়। বিতর্ক ও ক্ষোভের আরও গুরুতর সাম্প্রতিক কারণসমূহ হল, জনবিরোধী আচরণের জেরে গণবিদ্রোহের তোড়ে শাসনক্ষমতা থেকে উৎপাটিত হয়ে যাওয়ার পরেও প্রকৃত আত্মানুসন্ধানে প্রবল অনীহা, ভাবের ঘরে চুরি করা চলা, কেবল তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে পেকে ওঠা দ্বন্দ্বের ফল কুড়োনোর মতন আশায় রাখার সুবিধাবাদী পুনরুজ্জীবনের মোহ ছড়ানো ও সেই অভিলাষে নেতৃত্বের আপ্লুত থাকা। দলের সামাজিক ভিত্তি মোহবশত বা নিরাপত্তার তাগিদে পরের পর হয় তৃণমূল না হয় বিজেপির দিকে ভেঙ্গে যাচ্ছে কেন? এইসমস্ত ঘটনা প্রবণতা সি পি এম নেতৃত্বের ঘুম কেড়ে নিলেও ঘুরে দাঁড়ানোর প্রকৃত শুদ্ধিকরণ তাঁদের এজেণ্ডায় নেই। বারেবারে এটা প্রমাণিত হয়ে আসছে যে, ক্ষমতা সর্বস্ব চিন্তায় ডুবে থাকা এই দলটির মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত আন্তঃ মতাদর্শগত-রাজনৈতিক-সাংগঠনিক বিতর্ক চালানোর অনুমোদন নেই। নেতৃত্বের সর্বোচ্চ কুঠরি যা বলবে তাকে মেনে চলতে হবে, বড়জোর কিছু সংযোজনী সংশোধনী গ্রাহ্য হতে পারে। কিন্তু তীব্র বিতর্ক নয়। ক্ষমতা সমর্পিত থাকে ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের ক্ষমতাবান অংশের মধ্যে, স্থায়ী প্রবণতা হল প্রধান প্রধান মতপার্থক্যগুলোকে উন্মুক্ত করা নয়, ধামাচাপা দেওয়া, মতবিরোধগুলোকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি করা নয়, আদর্শহীন-নীতিহীন সমঝোতায় পরিণত করা। তারপরেও বিতর্ক নাছোড় থাকলে মোকাবিলা করা হয় আমলাতান্ত্রিক সাংগঠনিক জাঁতাকলে পিষে। আর চল হয়ে দাঁড়ায় বহিষ্কারের রাজনীতি এবং কায়েম হয় দমবন্ধ পরিস্থিতি। এই কালচার সি পি এমে গত শতকের ষাটের দশকে জন্মকাল থেকেই অনুসৃত হয়ে চলেছে। সেই পরম্পরা আজও চলছে। নকশালবাড়ীর বিপ্লবী জাগরণ এবং সি পি আই (এম এল) গঠনের সন্ধিক্ষণ-পরিস্থিতিতে সি পি এম নেতৃত্বের একদিকে আপসকামী-সুবিধাবাদী অন্যদিকে চূড়ান্ত আমলাতান্ত্রিক-কর্তৃত্ববাদী ভূমিকা বিস্মৃত হওয়ার নয়। পরবর্তীকালে সত্তর দশক, আশীর দশক, নব্বই-এর দশক এবং সর্বশেষ একুশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত ওঠা সমস্ত বিতর্কগুলোকে অবশেষে পর্যবসিত করা হয়েছে সমঝোতাবাদে। মানতে বাধ্য করা হয়েছে দলের ক্ষমতাবান অংশের চাপিয়ে দেওয়া অবস্থান। না মানলে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে বেরিয়ে যাওয়ার খোলা দরজা। সত্তর দশকের মাঝামাঝি কমরেড সুন্দরাইয়া আন্তঃপার্টি বিতর্কের জন্য দলিল দিয়েছিলেন। তদানীন্তন নেতৃত্ব সেই বিতর্ক চালাতে দেননি, দলিলটি চেপেই দিয়েছিলেন। নব্বইয়ের দশকে তদানীন্তন ভূমিসংস্কার মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী প্রশ্ন তুলেছিলেন সরকারটির ঠিকাদারশ্রেণী নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ার অধঃপতন নিয়ে। তা নিয়ে পার্টির মধ্যে কোনও বিতর্ক চালানো হয়নি। বরং জ্যোতিবাবু তখন বিনয় চৌধুরী মহাশয়ের দলে থাকার প্রাসঙ্গিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দেন। জ্যোতি বসু-বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মধ্যকার মতবিরোধের মীমাংসা খুঁজে নেওয়া হয়েছিল শেষোক্তজনকে মন্ত্রীসভা থেকে সরিয়ে দিয়ে, দলে গুরুত্বহীন করে দিয়ে। সেই বুদ্ধদেবকেই আবার জ্যোতিবাবুর বিকল্পের জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছিল যখন বুদ্ধদেব জ্যোতি বসুর পুঁজি ধরার লাইনে যোগ্য হয়ে ওঠার ঠিকেদারী নিয়ে নেন। ইউ পি এ (১) সরকারকে সমর্থন এবং সমর্থন প্রত্যাহার করা নিয়ে সি পি এমের আন্তঃবিতর্ক সমঝোতার চোরাবালিতেই আটকে থেকেছে। বুদ্ধদেবের কর্পোরেটমুখী উন্নয়ন নীতি নিয়ে দলের ভেতর কোনও বিতর্ক করতে দেওয়া হয়নি। এক কংগ্রেসী মাথাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সমর্থন করা নিয়ে প্রশ্ন তুললে দলের দিল্লীস্থিত বেশকিছু ছাত্র-যুব-তরুণ বুদ্ধিজীবীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একইভাবে নেতৃত্বের ক্ষমতা কুক্ষিগত করা অংশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার কারণে প্রাক্তন ভূমিসংস্কার মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লাকে বহিষ্কার করা হল। সর্বশেষ সংযোজন হল, দলের রাজ্য ওয়েবসাইট ইনচার্জকে বহিষ্কার, যেহেতু তিনি সাইটে নেতৃত্বের পরিবর্তনের দাবি তুলেছেন। দলের ভেতরে বিরোধ নিষ্পত্তির নীতিনিষ্ঠ গণতান্ত্রিক জলবায়ু না থাকলে তা তো বাইরে বজ্রাকারে ফেটে পড়বেই। সেটাই এখন ক্রমাগত ঘটছে সি পি এমের ভেতরে-বাইরে।

পরিবর্তনের যে দাবি নেতৃত্বকে লক্ষ্যবস্তু করে উঠছে তা সি পি এমের আন্তঃপার্টি জীবনের অনিবার্য নিয়মেই ঘটছে। কিন্তু সর্বোপরি প্রয়োজন হল, বিতর্ককে দলের অধঃপতিত দেউলিয়া নীতি-পলিসি, কর্মসূচী ও পথের পরিবর্তনের জন্য এবং সংগ্রামী বামপন্থার জন্য ফলদায়ক করে তোলার দিকে নিয়ে যাওয়া। তবে হয়তো মিলতে পারে সার্থকতা।

লোকসভা নির্বাচন ঃ সি পি আই (এম এল) লিবারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির পর্যালোচনা

২৫-২৭ মে, ২০১৪ নতুন দিল্লীতে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের শুরুতে নকশালবাড়ীর শহীদ কমরেডদের প্রতি এবং সি পি আই (এম এল)-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও কেন্দ্রীয় মুখপত্র *লিবারেশন*-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত কমরেড সুনীতি কুমার ঘোষ; কমরেড বনবিহারী চক্রবর্তী; লোকসভা নির্বাচনের সময়কালে নিহত কমরেড বুধরাম পাশোয়ান ও ইউসুফ মোল্লা; প্রয়াত কমরেড এস কে ভারতী, পূর্ণিয়া; শশীকুমার সিনহা, ধর্মনগর, ত্রিপুরা; নরসিং বাওরি, উড়িষ্যায় রায়গড়ার জেলা কমিটির সদস্য; বিহারের বর্ষীয়ান সি পি আই নেতা ত্রিবেণী শর্মা সুধাকর; রামচন্দ্র রাই; উত্তরাখণ্ডের পান সিং জন্ত্রী ও লালমোহন চোকিয়াল; তামিলনাড়ুর রাজা; মানবাবধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও নয়া সমাজবাদী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুকুল সিনহা; সমাজবাদী জন পরিষদ কর্মী সুনীল ভাই, পার্টির দীর্ঘদিনের সমর্থক জে কে ধৌণ্ডিয়ান, স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী কমরেড টমাস কোচেরি ও মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ নির্মল চন্দ্র-র প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটি ২০১৪-এর লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনা করে এবং সাথে সাথে নতুন জমানার প্রতি আমাদের মনোভাব ও কর্তব্যকর্ম স্থির করে।

কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকের মূল মূল আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ ঃ

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের রায় সম্পর্কে পর্যালোচনা ঃ (১) ২০১৪ সালের নির্বাচনী রায় দেখিয়ে দিচ্ছে যে কংগ্রেস বিপুলভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং বিজেপি/এন ডি এ পরিচালিত এক স্থায়ী সরকারের পক্ষে জনগণ রায় দিয়েছেন, যার প্রধানমন্ত্রী হলেন নরেন্দ্র মোদী। বড় বড় আকারের দুর্নীতি, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি এবং মনমোহন সিং, সোনিয়া গান্ধী ও রাহুল গান্ধীর চরম সংবেদনহীন, বিশ্বাসের অযোগ্য ও নাগালের বাইরে অবস্থানকারী নেতৃত্ব দেশজুড়ে কংগ্রেসের পতন ডেকে আনে (ব্যতিক্রম কেবলমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিছু ছোট রাজ্য এবং দক্ষিণের কেরালা ও কর্ণাটক) এবং এই শূন্যস্থান ভরাট করে বিজেপি তার ৩১ শতাংশ ভোট ও ২৮২টি আসন নিয়ে এবং তার সঙ্গে রয়েছে ২০ দলের জোট যা এন ডি এ ভোটের শতাংশকে ৩৮.৫ এবং আসন সংখ্যা ৩৩৫-এ দাঁড় করিয়ে দেয়।

(২) বিজেপি/এন ডি এ উত্তরপ্রদেশে এস পি এবং বি এস পি, বিহারে জে ডি (ইউ) এবং আর জে ডি-র মতো সামাজিক ন্যায়ের পার্টিগুলোর ওপর হতবুদ্ধিকর পরাজয় চাপিয়ে দিতে সফল হয় এবং এটাই ছিল বিজেপির 'মিশন ২৭২'-এর অভূতমাত্রায় সাফল্যের প্রধান বিষয়। কিন্তু এ আই ডি এম কে, টি এম সি, বিজেডি এবং টি আর এস-এর মতো আঞ্চলিক দলগুলো একইরকম দর্শনীয়ভাবে তাদের জমিকে ধরে রেখেছে। এই চারটি আঞ্চলিক দলের মিলিত আসন সংখ্যা ১০২, যা কংগ্রেসের প্রাপ্ত আসনের দ্বিগুণেরও বেশি।

(৩) সি পি আই এবং সি পি আই (এম) মিলিতভাবে ১০টি আসন পেয়েছে যা তাদের এ যাবৎ প্রাপ্ত সবচেয়ে কম আসন সংখ্যা। সি পি আই (এম) সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে পশ্চিমবঙ্গে যেখানে তাদের ১০ শতাংশ ভোট কমে গেছে এবং এই ভোট গেছে প্রধানত বিজেপির ঝুলিতে, যার ফলে এই রাজ্যে বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ দাঁড়িয়েছে ১৭। টি এম সি রাজ্যে ৪২টি আসনের মধ্যে ৩৪টি দখল করে নিয়েছে। সি পি আই (এম) এবং সি পি আই ত্রিপুরা ছাড়া আর কোথাও সরকারি ক্ষমতায় নেই এবং কোথাও তারা জোট গড়ার সুবিধাও পায়নি (বিহারে সি পি আই ছাড়া), তা সত্ত্বেও সি পি আই (এম) এবং সি পি আই-এর ভোটের শতাংশ (যথাক্রমে ৩.২ শতাংশ ও ০.৮ শতাংশ) এখনও তাৎপর্য বহন করে। আমাদের প্রাপ্ত ভোট ০.২ শতাংশ, ফরোওয়ার্ড ব্লকেরও তাই।

(৪) আপ ছাপ ফেলার মত ফলাফল করেছে, যদিও তারা তাদের ধার খুইয়েছে এবং তাদের ফলাফল প্রাথমিক উচ্ছাস ও লম্বা চওড়া দাবি থেকে অনেকটাই কম। দিল্লীতে আপের প্রাপ্ত ভোটের শতাংশ বেড়েছে, কিন্তু ৭টি আসনেই দ্বিতীয় স্থানে থেকেছে। কিন্তু পাঞ্জাবে আপ চমকপ্রদ ফলাফল করেছে, ৪টি আসনে জিতেছে, ১টা আসনে দ্বিতীয় স্থানে আছে এবং ভোট পেয়েছে ২৫ শতাংশ। পাঞ্জাবে আপ-এর দর্শনীয় ফলাফল প্রধানত পাঞ্জাব রাজ্যের বৈশিষ্ট্যকেই বহন করে, কিন্তু এর ফলে আপ এখন দুটি রাজ্যে শক্ত ভিত্তি অর্জন করেছে এবং জাতীয় স্তরে তারা পেয়েছে ২ শতাংশ ভোট। মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, কেরালা ও কর্ণাটকে আপের প্রার্থীরা অনেক আসনে ভালো ভোট পেয়েছে। আপের এখন প্রধান উদ্বেগ হল যে তারা দিল্লীতে নিজেদের ধার হারিয়েছে, ভাবমূর্তির ধারাবাহিক ক্ষয় ঘটছে এবং সংগঠনে রাজনৈতিক বিভ্রান্তি ও মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এছাড়া জাতীয় স্তরেই সামগ্রিক দিশা প্রদান ও সংগঠনের সংহতকরণে ঘাটতি থাকছে।

(৫) নির্বাচনে অর্থবলের ভূমিকার মতো এই নির্বাচনে কর্পোরেট ঘরানা ও কর্পোরেট প্রচার মাধ্যমগুলোর দলীয় ভূমিকা খুবই প্রকট। বিজেপির এই বিজয় অভিযানে সাম্প্রদায়িক হিংসা ও সাম্প্রদায়িক প্রচার মূল ভূমিকা নিয়েছে। বিজেপি যত শতাংশ ভোট পেয়েছে তার তুলনায় তাদের আসন প্রাপ্তি অনেক বেশি। এটা তাই জনগণের রাজনৈতিক পছন্দের যথাযথ প্রতিফলন ঘটাতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা চালু করার দাবিকে সঠিকভাবেই সামনে আনছে। একইভাবে নির্বাচনী সংস্কারের অন্যান্য দিকগুলোও সমানভাবেই প্রাসঙ্গিক—যেমন, কেবলমাত্র প্রার্থীদেরই নয় পার্টিগুলোর খরচের ওপর সীমা আরোপ করা, নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর জনমত সমীক্ষার ওপর নিষেধাজ্ঞা, নির্বাচিতকে ফিরিয়ে আনার অধিকার ইত্যাদি।

(৬) শেষ বিশ্লেষণে আমাদের এটা মেনে নিতে হবে যে শুরু থেকেই বিজেপির প্রচারের রাজনৈতিক ধার ছিল এবং মোদীর হাই ভোল্টেজ প্রচার জাতীয় স্তরে বিজেপির পক্ষে এক ইতিবাচক মনোভাব এবং 'অব কি বার মোদী সরকার' শ্লোগানকে কেন্দ্র করে এক কার্যকরী জোট গড়ে তোলে এবং 'সুসময়' আসার এক আশা জাগিয়ে তোলে। আর এস এস দ্বারা ধারাবাহিকভাবে ও ভালো পরিমানে চালানো সাম্প্রদায়িক প্রচার সংযোগে বিজেপির পক্ষে এক মুড তার চিরাচরিত সামাজিক ও ভৌগলিক সীমাকে ছাড়িয়ে যায় এবং সামাজিক বিভাজন ও আঞ্চলিক সীমাকে অতিক্রম করে দেশজুড়ে এক বড় অনুরণন সৃষ্টি করে। গ্রাম ও শহরের গরিবদের বড় অংশ এবং বিশেষ করে যুব ও নতুন ভোটাররা বিজেপির পক্ষে ভোট দেয়। বিজেপির পক্ষে পড়া সমস্ত ভোটকে সাম্প্রদায়িক ভোট হিসাবে গণ্য করার পরিবর্তে আমাদের অবশ্যই আন্তরিকভাবেই বিজেপির সামাজিক সমর্থনের বর্ধিত অংশের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এবং যারা বিজেপির পক্ষে ভোট দিয়েছে তাদের মধ্যকার শ্রমজীবী জনগণ ও যুবকদের কাছে ধারাবাহিক ও বুঝিয়ে বলার মনোভাব নিয়ে আন্তঃক্রিয়া চালাতে হবে।

(৭) ২০১৪ সালের নির্বাচনী রায় রাজনীতিতে এক আক্রমণাত্মক দক্ষিণমুখী মোড় পরিবর্তন সূচীত করছে, যা স্বজন-পোষণ ভিত্তিক পুঁজিবাদকে জোরদার করবে। ভারতের শাসকশ্রেণী ১৯৮০ সালের অর্থনৈতিক সংকটকে কাজে লাগিয়ে যেমন উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের কর্মনীতির আক্রমণ নামিয়ে আনে, তেমনি তারা এই নীতি থেকেই উদ্ভূত বর্তমান সংকটকে কাজে লাগিয়ে নয়া উদারনৈতিক নীতির আক্রমণকে আরও তীব্র করে তুলছে। নির্বাচনী প্রচার ও নির্বাচনী ফলাফল সাম্প্রদায়িকতার গতিবিধি আরও বেড়ে ওঠা ও 'কঠোর রাষ্ট্র'-র আক্রমণকে সূচীত করেছে যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতার সমগ্র বিষয়টির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হাজির করছে।

মোদী সরকার এবং আমাদের মনোভাব ও কর্তব্যকর্ম

(১) আমাদের এটা বুঝতে হবে যে জনগণের আশা আকাঙ্খার ঢেউয়ের ওপর ভর করে নতুন সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এখন আমাদের কাজ হল, একদিকে এই জমানার কর্পোরেট-সাম্প্রদায়িক এ্যাজেণ্ডা ও তার বিশ্বাসঘাতকতা এবং অপরদিকে জনগণের আশা আকাঙ্খার মধ্যকার সংঘাতকে উন্মোচিত করা ও তা তীব্র করে তোলা। সরকারের প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো স্পষ্টতই তার কর্পোরেট সাম্প্রদায়িক এ্যাজেণ্ডা ও স্বৈরতান্ত্রিক ধরণের শাসনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রথমদিন থেকেই দেশের গণতন্ত্র, বহুত্ববাদ/ধর্মনিরপেক্ষতাকে ও জনগণের অধিকারকে রক্ষা করতে আমাদের অবশ্যই সতর্ক, দৃঢ় ও প্রস্তুত থাকতে হবে।

(২) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল এই প্রতিরোধ অভিযানে জনগণকে সমাবেশিত করা। আজ প্রয়োজন হল কার্যকরী ও বিশ্বাসযোগ্য প্রচার সহযোগে এক নিবিড় গণসংযোগ অভিযান এবং সুসম্বদ্ধভাবে জনগণের আন্দোলন গড়ে তোলা। সমস্ত গণসংগঠনকে অবশ্যই নতুন সরকারের পদক্ষেপগুলোকে নজরে রাখতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট জনগণের মূল ইস্যুগুলোকে সুসম্বদ্ধভাবে তুলে ধরতে হবে, জোর থাকবে আমাদের কর্মী বাহিনীকে সমাবেশিত করা ও আমাদের গণভিত্তির বিস্তার ঘটানো।

(৩) বিজেপির অভূতপূর্ব ও একপেশে জয়ে অনেক জনগণের মনে স্পষ্টতই এক ভীতি রয়েছে। নির্বাচনী রায়ে উজ্জীবিত হয়ে সামন্ততান্ত্রিক-সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো ও সংঘের ঝটিকাবাহিনী তাদের নখ-দাঁত মেলতে শুরু করেছে। আমাদের অবশ্যই জনগণের কাছে যেতে হবে এবং যাদের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে ও আক্রমণের শিকার হতে পারে তাদের পাশে থাকতে হবে, সামাজিক/রাজনৈতিক হিংসা ও ধংসাত্মক কাজের প্রতিটি ঘটনায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

(৪) মোদী ঝড়ের ফলে বাম ও অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শিবিরে নতুনভাবে ভাবনাচিন্তা ও মন্থন শুরু হয়েছে। ব্যাপক গণতান্ত্রিক মহলে যে আশঙ্কা ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে তা আমাদের বুঝতে হবে এবং গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সাথে ব্যাপক আন্তঃক্রিয়া ও অর্থবহ সহযোগিতার সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখতে হবে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি প্রস্তাব সমস্ত ধরণের বাম ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হবে।

ম্যানেজমেন্টের জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজের নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলের শ্রমিকরা ২০১০ সালে পুরানো চুক্তি বর্ষ শেষ হয়ে যাওয়ার পর দীর্ঘ ৪ বছর যাবত ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। বারংবার দাবি করা সত্ত্বেও ম্যানেজমেন্ট তা একতরফাভাবে অস্বীকার করে এসেছে। কস্মিনকালেও শ্রমিকশ্রেণী যা দেখেনি, তা তৃণমূল পরিচালিত সরকারের আমলে দেখলো নিউ সেন্ট্রালের শ্রমিকরা। যে কারখানায় ৪২ শতাংশ সরকারের এবং ৫২ শতাংশ শ্রমিকের শেয়ার থাকা কো-অপারেটিভ পরিচালিত নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলে, স্থানীয় তৃণমূল এম এল এ-র নেতৃত্বে কিছু পেটোয়া দালাল ইউনিয়নের সাহায্যে কারখানার পরিচালন সংস্থা গায়ের জোরে দখল করে নেয়। দখলদার বর্তমান পরিচালকরা আজও দেখাতে পারেনি সরকারের অনুমতি তারা পেয়েছে কিনা, আর সরকার এই বে-আইনি দখলদারীর বিরুদ্ধে কোন কথা বলেনি।

এরকম এক পরিচালক সংস্থা ক্ষমতায় বসেই কারখানার গচ্ছিত ব্যাঙ্কের অর্থ এবং গোডাউনে মজুত থাকা তৈরী মাল বিক্রী করে কোটি কোটি টাকা লুঠ করে নেয়। শ্রমিকদের থেকে কেটে রাখা পি এফের টাকা পি এফ দপ্তরে জমা না দেওয়া, পেনশন ও পি এফ-এর টাকা শ্রমিকদের প্রদান না করা, শিল্পভিত্তিক মজুরি না দেওয়া এবং দীর্ঘদিন শ্রমিকদের প্রমোশন না দেওয়া, উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সমস্ত মেশিন না চালানো, স্পেয়ার পার্টস সাপ্লাই চালু না করে মেশিন বন্ধ করে দিয়ে স্ক্র্যাপে পরিণত করার চক্রান্ত চলছিল।

এই অন্যান্য জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজ থেকে বসিয়ে দিয়ে এক সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরী করেছিল। বি সি এম এফের নেতৃত্বে শ্রমিক সুরক্ষা মঞ্চ যখন ঐক্যবদ্ধ লড়াই করে, তখন ম্যানেজমেন্ট মঞ্চের নেতাদের অন্যায়ভাবে কাজ থেকে বসিয়ে দিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরী করে।

এরকম এক পরিস্থিতিতে কোম্পানীতে একটি টাকাও বিনিয়োগ না করে কারখানার ভালো করার অজুহাত দেখিয়ে ম্যানেজমেন্ট, কিছু পেটোয়া দালাল ইউনিয়ন নেতাদের সহযোগিতায় কারখানা চালু মেশিন ও কোটি কোটি টাকার লোহালক্কড় বিক্রী করার সিদ্ধান্ত নেয়। অথচ কারখানার সম্পত্তি বিক্রী করার কোন সরকারি অনুমতি দেখাতে পারেনি। বি সি এম এফ ইউনিয়ন নেতৃত্ব কমরেড লক্ষ্মী অধিকারী ম্যানেজমেন্টের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে, তা সত্ত্বেও ম্যানেজমেন্ট ও দালাল ইউনিয়ন দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত নোটিশ আকারে দেওয়ালে টাঙ্গায়। তার প্রতিবাদে কমরেড লক্ষ্মী সহ বি সি এম এফ নেতৃত্ব ও অন্যান্য ইউনিয়নের নীচুতলার বিক্ষুব্ধ কর্মীরা ৫ দফা দাবির ভিত্তিতে ম্যানেজমেন্টের কাছে ১ জুন শত শত শ্রমিকদের নিয়ে ডেপুটেশন দেয় এবং এক জঙ্গী মিছিল সংগঠিত করে, যাতে হাজার হাজার শ্রমিককের মনোবল ফিরে পায়। ম্যানেজমেন্টের তৈরী একতরফা সন্ত্রাস ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে শ্রমিকরা এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা তৈরী করে নেয়।

এগিয়ে যাওয়ার লড়াই সবে শুরু, এবার হকের অধিকার ছিনিয়ে নিতে আগামী দিনে বড় বড় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিতে হবে। একমাত্র ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনই পারে জয় ছিনিয়ে নিতে। **- কিশোর সরকার**

২০১৪-র রায় ... যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এল

একের পাতার পর

বিজেপির লাগাতার বাংলাদেশী-বিরোধী ঘৃণার প্রচারের ফলে যা ঠাণ্ডামাথায় সাম্প্রদায়িক হিংসায় পরিণত হয়েছিল।

যে ধরণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিজেপি লাভ করেছে তার জন্য শুধু তার শাসনাধীনে থাকা গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের মত রাজ্যগুলো থেকে বিপুল জয়লাভই যথেষ্ট ছিল না। সেটা সে অবশ্যই করেছে, ঐ চারটি রাজ্যে মোট ৯১টি আসনের মধ্যে মাত্র ৩টি সে হারিয়েছে। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, উত্তরপ্রদেশ—যেখানে গত কয়েক বছরে সে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল—এবং বিহার ও ঝাড়খণ্ডের মত রাজ্যগুলো থেকে—যেখানে সে আর ক্ষমতায় ছিল না—ব্যাপক জয়লাভ। বিজেপি এটাও অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন করেছে, তার মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের মোট ১৩৪টি আসনের মধ্যে অভাবিতভাবে সে পেয়েছে ১১৬টি আসন।

উত্তরপ্রদেশে এস পি এবং বি এস পি, বিহারে আর জে ডি এবং জে ডি (ইউ)-র মত শক্তিশালী আত্মপরিচিত-ভিত্তিক দলগুলোকে পিছনে ঠেলে দিয়েই হিন্দি বলয়ে বিশেষভাবে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে। মূল ধারার সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমে এই সাফল্যকে প্রথাগত জাতপাত-ভিত্তিক আনুগত্যকে ছাড়িয়ে গিয়ে উন্নয়নের জন্য ভোট বলেই ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। জাতপাত নির্বিশেষে উন্নয়নের জন্য আকাঙ্খা যে বেড়ে চলেছে তা অবশ্যই বাস্তব ঘটনা এবং মোদীর প্রচারও এই রূপে তাঁকে বিকোতে সফল হয়েছে যে, তিনি হলেন তথাকথিত 'গুজরাট মডেল'-এর রূপকার এবং ভারতীয় জনগণের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ও আকাঙ্খাগুলো পূরণের ব্যাপারে তাঁর ওপর ভরসা করা যায়। তবে এই ঘটনাকেও অস্বীকার করা যাবে না যে, জাতপাত ও সম্প্রদায়গত বিষয়গুলোকে বিজেপি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরে সেগুলোকে কাজে লাগিয়েছে।

নরেন্দ্র মোদীর মধ্যে পশ্চাদপদ জাতের এক শক্তিশালী মুখকে পরিশেষে পেয়ে গিয়ে বিজেপি মোদীর পশ্চাদপদ জাতের মূলকে জাহির করতে কোন কসুর করেনি। বস্তুত, গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়া জুড়েই আর এস এস/বিজেপি জাতপাতের ওপর জোর দিয়ে মোদীকে চরম পশ্চাদপদ সামাজিক পৃষ্ঠভূমি থেকে উঠে আসা প্রথম সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী রূপে তুলে ধরতে থাকে। মোদী যেভাবে প্রিয়াঙ্কার 'নীচ রাজনীতি'র মন্তব্যকে বিকৃত করেছেন, সেটাকে পশ্চাদপদ জাতের ওপর কালিমা লেপন বলে দেখিয়ে আবেগঘন আবেদন জানিয়েছেন, ''আমাকে অপমান করুন, আমার জাতের অবমাননা করবেন না'', তাতে জাতপাতের দিকটি প্রকট হয়ে ওঠে। বিজেপি যথেষ্ট হিসেব করেই তার মিত্রদের বাছে যাতে করে দলিত/ওবিসি-দের মধ্যে তার অনুপ্রবেশকে সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী করা যায় ঃ উত্তরপ্রদেশে সে বেছে নেয় আপনা দলকে এবং বিহারে তার শরিক হয় এল জে পি এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহার নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রীয় লোক সমতা পার্টি। আর সর্বোপরি শ্রেণী সংহতিকে ভাঙ্গার চেষ্টা চালিয়ে তাতে সফল হতে এবং সমস্ত ধরণের সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটাতে বিজেপি নিরবচ্ছিন্নভাবে সাম্প্রদায়িক প্রচার চালিয়ে গেছে। একথাও মনে রাখা জরুরী যে, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের শাসক সরকারগুলো সম্পর্কে জনগণের সার্বিক মোহভঙ্গও বিজেপির প্রচেষ্টাকে বিপুলভাবে সহজসাধ্য করে তুলেছে।

বিজেপির অধিকাংশ আসন দেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চল থেকে এলেও পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ অঞ্চলেও তার নজরকাড়া উপস্থিতি দেখা গেছে। সে আসামে ১৪টি আসনের মধ্যে ৭টি আসন, অরুণাচলে ২টির মধ্যে ১টি আসন এবং তার জোট শরিকদের সাথে নাগাল্যাণ্ড ও মেঘালয়ে আরও ২টি আসন পেয়েছে এবং এইভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে এন ডি এ-র ঝুলিতে এখন ১০ জন সাংসদ। আসামে বিজেপি অগপকে কার্যত গ্রাস করে নিয়ে তাকে যথেষ্ট ব্যবধানে তৃতীয়, চতুর্থ বা আরও নিম্ন স্থানে ঠেলে দিয়েছে। পশ্চিমবাংলাতেও বিজেপির বৃদ্ধি যথেষ্ট লক্ষণীয়—১৯৯৯ সালে টি এম সি-র জোট সঙ্গী হিসেবে সে দুটি আসন পেয়েছিল। এবার আসানসোল আসনে সে নিজের জোরেই জয়ী হয়েছে এবং রাজ্যে তার প্রাপ্ত ভোটের হার ১৭ শতাংশ, ২০০৯-এর তুলনায় যা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি। মূলতঃ বামফ্রন্টের ভোট কেটেই বিজেপির এই বৃদ্ধি হয়েছে এবং বামফ্রন্টের ভোট ২০১১-র ৪০ শতাংশ থেকে কমে ২০১৪-তে দাঁড়িয়েছে ৩০ শতাংশের কাছাকাছি। বিজেপি প্রার্থীরা যে টি এম সি-র শক্তিশালী জায়গা উত্তর কলকাতা ও দক্ষিণ কলকাতা আসনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে এবং এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর বিধানসভা ক্ষেত্রেও অল্প ব্যবধানে এগিয়ে থেকেছে, সেটাও কম তাক লাগানো ব্যাপার নয়।

কর্ণাটককে বাদ দিলে দক্ষিণের রাজ্যগুলোতেই মোদী হাওয়া ছিল সবচেয়ে দুর্বল। কিন্তু দক্ষিণের কেরলেও বিজেপি ১০ শতাংশ ভোট পেয়েছে এবং তিরুবনন্তপুরম আসনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে (কেরল রাজধানীর এই আসনে বিজেপি প্রার্থী এমনকি ৭টি বিধানসভা ক্ষেত্রের ৪টিতে এগিয়ে থাকে)। কাসারগোড় আসনের দুটি বিধানসভা ক্ষেত্রেও বিজেপি দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। প্রতিবেশী তামিলনাড়ুতে মোট প্রদত্ত ভোটের ৫ শতাংশ পেয়ে বিজেপি তৃতীয় স্থান লাভ করে, যদিও সেই তৃতীয় স্থানে ব্যবধান অনেক ছিল। রাজ্যের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তের কন্যাকুমারি আসনে বিজেপি জয়ী হয়ে প্রথমবারের মত এই রাজ্য থেকে বিজয় হাসিল করে। বিজেপির মিত্রদের প্রাপ্ত ভোটের হার অবশ্য কমে গেছে। পুনরুত্থিত তেলেগু দেশম পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে সীমান্ধ্রতেও বিজেপি দুটি আসন পেয়েছে। কর্ণাটকে বিজেপির আসন সংখ্যা ২০০৯-এর ১৯ থেকে কমে ১৭ হয়েছে, কিন্তু মাত্র এক বছর আগে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে সে যে মাত্র দুটি লোকসভা আসনে এগিয়ে ছিল, সেকথা বিবেচনা করলে এবারের ১৭টি আসন লাভকে হারানো জমির ব্যাপক পুনরুদ্ধারই বলতে হবে। ২০১৩-র ১৯.৯ শতাংশের তুলনায় ২০১৪-র ৪৩ শতাংশ প্রাপ্ত ভোট বিরাটভাবে ঘুরে দাঁড়ানোটাকেই দেখিয়ে দিচ্ছে।

সারা ভারত জুড়ে বিজেপির প্রভাব দেখা গেলেও এটা খেয়াল রাখতে হবে যে তার প্রাপ্ত ভোটের হার মাত্র ৩১ শতাংশ, যা ১৯৬৭ সালে কংগ্রেসের পাওয়া ভোটের হারের চেয়ে ১০ শতাংশ কম, যে বছর কংগ্রেসও প্রায় একই সংখ্যক আসন পেয়েছিল। আর প্রাপ্ত এই ভোটের হার এতদিনের ইতিহাসে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা কোন দলের পক্ষেও সবচেয়ে কম। বিজেপির এই ভোটের হার এমনকি ১৯৭৭ সালে কংগ্রেসের পাওয়া ভোটের হারের চেয়েও ৩ শতাংশ কম, যে বছর প্রথমবার কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়েছিল। যারা এবার ভোট দিয়েছে তাদের ৬৯ শতাংশ যে বিজেপির পক্ষে ভোট দেয়নি (এন ডি এ বিরোধী ভোটের কথা ধরলে ঐ হার ৬১.৫ শতাংশ) সেই বিষয়টাকে তুলে ধরার সাথে সাথে ১৯৭৭ সাল থেকে ভোটের যে বিভাজন ঘটে চলেছে সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। বিজেপি ও কংগ্রেস একত্রে পেয়েছে মাত্র ৫০ শতাংশ ভোট এবং বাকি ৫০ শতাংশ গেছে বহুসংখ্যক অ-বিজেপি অ-কংগ্রেস দলের পক্ষে। মোদী হাওয়া এটাই দেখিয়ে দিল যে, বহু-দলীয় ব্যবস্থায় কোন দল মাত্র ৩১ শতাংশ ভোট পেয়েও একের পর এক রাজ্যে বিপুলভাবে বিজয়ী হতে পারে এবং অধিকাংশ আসনে জয়ের ব্যবধানও উল্লেখযোগ্য হতে পারে (বিজেপি যে ২৮২টি আসন পেয়েছে তার মধ্যে ১৯৫টি আসনে জয়ী হয়েছে ১ লক্ষের বেশি ভোটে)।

বিজেপির পক্ষে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা শুধু কংগ্রেসকেই একেবারে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দেয়নি, তা নির্বাচন পরবর্তী পর্যায়ে কোন ধরণের 'তৃতীয় ফ্রন্ট' সরকারের সম্ভাবনাকেও সন্দেহাতীতভাবে বাতিল করে দিয়েছে। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে যুক্তফ্রন্ট নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা একবারেই ক্ষণস্থায়ী ও অস্থিতিশীল হয়েছিল এবং তারপর থেকে লোকসভা বা রাজ্য বিধানসভাগুলোর নির্বাচন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের পক্ষেই রায় দিয়ে এসেছে, ২০০৫-এর ফেব্রুয়ারির বিহার বিধানসভা বা ২০১৩-র দিল্লী বিধানসভা নির্বাচন ঐ ধারার ব্যতিক্রমই ছিল। এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী তাঁর ভাষণে স্থিতিশীল সরকারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। বিজেপিও তার নির্বাচনী প্রচারের সমগ্র পর্যায় জুড়ে 'স্থিতিশীল সরকার'-কেই প্রচারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় করে তুলে 'মিশন ২৭২+'-কেই তার লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করে। নির্বাচন কমিশনও ভোটার সচেতনতার প্রসারের লক্ষ্যে বড় ধরণের প্রচার চালায় এবং সর্বকালের মধ্যে এবারই প্রদত্ত ভোটের হার সবচেয়ে বেশি হয়, যদিও নোটার পক্ষে যায় ১.১ শতাংশ ভোট!

মাত্র তিনটি অ-ইউ পি এ এবং অ-এন ডি এ দল উল্লেখযোগ্যভাবে নিজেদের ঘাঁটিকে ধরে রাখতে পেরেছে এবং তারা হল তামিলনাড়ু, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতায় জাঁকিয়ে বসে থাকা তিনটি আঞ্চলিক দল। পশ্চিমবাংলায় টি এম সি অবশ্য নির্বাচনের আগে ও তা চলাকালীন ব্যাপক সন্ত্রাস চালায়, তবে এ ঘটনা অস্বীকারের নয় যে এই তিনটি রাজ্যেই ফলাফল রাজনৈতিক শক্তিগুলোর বিদ্যমান ভারসাম্যকে প্রতিফলিত করেছে। এই দলগুলো ও তাদের নেতৃত্বাধীন সরকারগুলো সম্পর্কে জনগণের যথেষ্ট মোহভঙ্গ ঘটেছে, তবে সামগ্রিক ভারসাম্য তাদের অনুকুলেই রয়েছে এবং নির্বাচনের ফলাফলে এই রাজনৈতিক বাস্তবতার সমর্থন মিলেছে।

২০১৪-র নির্বাচন বামজোটের সবচেয়ে খারাপ ফলাফলকে নির্দেশিত করছে। সি পি আই (এম) ২০০৪-এর নির্বাচনে ৪৪টি আসন পেয়েছিল, ২০০৯-এর নির্বাচনে তা যথেষ্ট সংখ্যায় কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১৬ এবং ২০১৪-তে তার আরও নেমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৯টি আসনে। সি পি আই ২০০৪ সালে যেখানে ১০টি আসন পেয়েছিল এখন তার দখলে সাকুল্যে একটি আসন। ফরোয়ার্ড ব্লক কোন আসন পায়নি এবং আর এস পি কেরলে একটি আসন পেলেও তা এসেছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ ডি এফ-এর সমর্থনের ভিত্তিতে! সি পি আই (এম এল) আরও একবার একটি আসনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে এবং দুটি আসনে তৃতীয় হয়েছে এবং মার্ক্সিস্ট কো-অডিনেশনও একটি আসনে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। একমাত্র এবারের নির্বাচনেই সি পি আই এবং সি পি আই (এম)-এর জোট-কৌশল দানা বাঁধেনি, একমাত্র বিহারেই জে ডি (ইউ) সি পি আই-এর সঙ্গে আসন সমঝোতায় সম্মত হয় এবং জে ডি (ইউ)-র সমর্থন সত্ত্বেও সি পি আই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দুটি আসনেই তৃতীয় স্থান পায়। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, জনগণের ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বাম ভিত্তিকে সম্প্রসারিত ও উজ্জীবিত করে তোলার বুনিয়াদি চ্যালেঞ্জকে কারা কতটা গ্রহণ করতে পারছে তার ওপরই নির্ভর করবে বামেদের সমস্ত অংশের রাজনৈতিক পরিচিতি।

বামেদের ভোটে ক্ষয় হলেও আমাদের এই বিষয়টা বিবেচনায় রাখতে হবে যে, ক্ষমতায় না থাকা অবস্থায় (একমাত্র ব্যতিক্রম ত্রিপুরা) এবং অন্য কোন শাসক দলের মদত ছাড়াই (এক্ষেত্রেও একমাত্র ব্যতিক্রম বিহারে জে ডি (ইউ)-র সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে সি পি আই-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা) বামেদের পক্ষে এই ভোট এসেছে। যৌথভাবে সি পি আই (এম) এবং সি পি আই-এর ৪ শতাংশ ভোট প্রাপ্তির (সি পি আই (এম)-এর ৩.২ এবং সি পি আই-এর ০.৮ শতাংশ) অতএব নিজস্ব তাৎপর্য রয়েছে। বাম ভোট প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সি পি আই (এম এল) যে ০.২ শতাংশ ভোট পেয়েছে তা তুলনায় অনেক কম ঠিকই, কিন্তু এটা এমনই ভিত্তি যা শুধু সাম্প্রদায়িক হিংসা ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মোকাবিলা করেই টিকে থাকেনি, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনীতির নানা টানাপোড়েনের মুখেও তা স্বাধীন বাম আত্মঘোষণার পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

মোদীর প্রচারের পরই যে দলটি নিয়ে এবার বেশি চর্চা হয়েছে তা হল আম আদমি পার্টি। আপ এবার ৪০০টি আসনে প্রার্থী দেয় এবং তার মধ্যে ছিল দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা কিছু ব্যক্তিত্ব, কর্পোরেট পরিচালক, পেশাজীবী, সমাজ আন্দোলনের কর্মী, বিভিন্ন রাজনৈতিক পৃষ্ঠভূমি থেকে আসা নেতৃবৃন্দ এবং তার সঙ্গে এমন প্রার্থীও ছিলেন যাঁদের জনগণের মধ্যে কাজ করা বা সামাজিক আন্দোলনের কোন ইতিহাস নেই। আপ শেষমেষ যে ৪টি আসন পেয়েছে, ৯টি আসনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে এবং সর্বভারতীয় স্তরে ২ শতাংশ ভোট পেয়েছে, তা প্রথমবার লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা একটি দলের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ফল। তবে নির্বাচনের আগে তাকে নিয়ে যে হৈ চৈ হয়েছিল এবং সে নিজেও কম করে ৫০টি আসন পাওয়া এবং পরবর্তী সরকার গঠনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখার যে দাবি করেছিল, এই ফল তার ধারেকাছে হয়নি। বিরোধী দল হিসেবে আপ কেমনভাবে তার বিকাশ ঘটায় তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, আপের তাত্ত্বিকরা যদিও বলছেন যে, বামেরা সহ সমগ্র রাজনৈতিক বিন্যাসের সাপেক্ষে তাঁদের দলই হল উদীয়মান বিকল্প।

দিল্লীতে তাদের প্রাপ্ত ভোটের হার বাড়লেও সেখানে তাদের ফল সবথেকে ভালো হয়নি এবং সেখানে তারা একটি আসনও পায়নি। গুরুত্বের দিক থেকে যে দুটি রাজ্য ঐ দলের প্রথমদিকে ছিল, সেই হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রেও দলের ফল উল্লেখযোগ্য নয়। যথেষ্ট অপ্রত্যাশিতভাবে একমাত্র পাঞ্জাব থেকেই আপ ২০১৪-র নির্বাচনে কয়েকটি আসনে বিজয়ী হয়েছে, রাজ্যের ১৩টি আসনের মধ্যে ৪টিতে সে জয়ী হয়। আপ একটি আসনে দ্বিতীয় এবং বাকি ৮টি আসনে তৃতীয় স্থান লাভ করে এবং ৩১টি বিধানসভা ক্ষেত্রে সে এগিয়ে থাকে। আকালি দল ও বাদল পরিবারের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়েই ক্ষোভ তীব্রতর হয়ে ওঠায় আপ পাঞ্জাবে তার অনুকূলে জুতসই এক শূন্য পরিসর পেয়ে গিয়েছিল।

গত বিধানসভা নির্বাচনে মনপ্রীত সিং বাদলের নেতৃত্বাধীন পাঞ্জাব পিপল্‌স পার্টি (পি পি পি) এই ক্ষোভকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে এবং রাজ্যে এক তৃতীয় শক্তি হিসাবে উঠে আসে। এবার মনপ্রীত সিং বাদল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধায় মোহভঙ্গ ঘটে যাওয়া পি পি পি সমর্থকরা আপের পক্ষে মজুত এক ভিত্তি হয়ে দেখা দেয়। দিল্লীতে ক্ষমতায় থাকার সময় ১৯৮৪-র শিখ-বিরোধী দাঙ্গার তদন্তের বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের যে সিদ্ধান্ত কেজরিওয়াল নেন, তার জন্য আপ পাঞ্জাবে যথেষ্ট সহানুভূতি পেয়েছিল। দিল্লীতে আপ কংগ্রেসের ভোট কেটে তার প্রাপ্ত ভোটের হারকে বাড়াতে পেরেছে, তবে তার ভোটারদের ভালো অংশ বিজেপির দিকে চলে যায় এবং তা কিছুটা মোদী হাওয়ায় এবং ব্যাপক অংশই আপকে ছেড়ে যায় মাত্র ৪৯ দিন পর পদত্যাগ করার কেজরিওয়ালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায়।

সুস্পষ্টভাবেই দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৪-র রায়ের পর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আমূল পাল্টে গেছে। নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর এন ডি এ লোকসভায় অবাধে কার্যকলাপ চালাতে পারবে, একমাত্র রাজ্য সভাতেই সদস্য সংখ্যা কিছুটা তার প্রতিকূলে থাকবে। নির্বাচন পরবর্তী পর্যায়ের প্রতিক্রিয়া বিহার ও আসামের মত

পাঁচের পাতায় দেখুন

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ইতিহাসবিদ অমলেন্দু দে স্মরণে (১৯৩০-২০১৪)

গত ১৬ মে ২০১৪ প্রয়াত হয়েছেন ইতিহাসবিদ অমলেন্দু দে। ইতিহাসের একজন অধ্যাপক যথার্থভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, যিনি সারাটা জীবন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির স্বার্থে একাগ্রচিত্তে কাজ করে গিয়েছেন—ঠিক তাঁর মৃত্যুর সময়টাতেই দিল্লীর মসনদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কায়েম হল সংঘ পরিবারের শাসন কর্তৃত্ব। সত্যিই ইতিহাসের এ এক বিচিত্র পরিহাসই (আয়রণি) বটে।

১৯৩০ সালের ২ জানুয়ারি বাংলাদেশের মাদারিপুরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা গোপাল চন্দ্র দে-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা ও কর্মীর। এদের হয়ে অমলেন্দু দে-র পিতা অনেক মামলা পর্যন্ত লড়েছেন। সুতরাং পারিবারিক সূত্রেই কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনের পরিবেশে গড়ে উঠেছিল তাঁর বাল্য ও কৈশোর জীবন। ১৯৪২-৪৩ সালে তিনি যুক্ত হন নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন ও কিশোর বাহিনীর সঙ্গে। তাঁর পিতার কাছ থেকে উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন সোভিয়েত (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস। সারাজীবন সেটিকে তিনি অন্যতম সেরা সম্পদ হিসেবে আঁকড়ে থেকেছেন। তাছাড়াও তিনি সরাসরি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ, তেভাগা আন্দোলন ও দেশ বিভাগের মতো ঘটনার। প্রত্যেকটি ঘটনাই তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

১৯৪৬ সালে মাদারিপুর ইংলিশ হাইস্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৮ সালে সিটি কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তারপর অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বি এ ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা জনিত কারণে তাঁকে পুনরায় মাদারিপুরে এক বছরের জন্য ফিরে আসতে হয়েছিল। একবছর বাদ দিয়ে তিনি বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ১৯৫১-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে এম এ ক্লাসে ভর্তি। সেই সময় তাঁর সহপাঠিনী ছিলেন নাসিমা বানু—১৯৪০-এর দশকে বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও কৃষক প্রজা দলের নেতা ফজলুল হকের সম্পর্কিত দৌহিত্রী। পরবর্তীকালে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুযায়ী তাঁরা দুজনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

১৯৫৪-তে হাওড়ার উলুবেড়িয়া কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান। বেশ কিছুকাল যাবত তিনি পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষক সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৯ সালে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন কলকাতার মুরলীধর গার্লস কলেজে। এই সময়কালেই ইতিহাস সম্পর্কিত তাঁর যাবতীয় গবেষণা কর্মের সূত্রপাত ঘটে মহাফেজখানায়, জাতীয় গ্রন্থাগারে ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে।

১৯৬২-র ভারত-চীন যুদ্ধের সময়ে দক্ষিণপন্থী মহল থেকে এক রাজনৈতিক কুৎসার সম্মুখীন হন। তাঁর অপরাধ ছিল এই যে তিনি চেয়েছিলেন দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে এর এক শান্তিপূর্ণ সমাধান। ফলশ্রুতিতে এমনকি '৬৩ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে নিয়োগ সংক্রান্ত ফাইলকে ঘিরে এক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষজনের হস্তক্ষেপে এই জটিলতার নিরসন হয়। তারপর সেখানেও অধ্যাপনা শুরু—পরবর্তীতে গুরু নানক অধ্যাপক পদে বৃত হন। ১৯৯৫ পর্যন্ত তিনি ঐ পদেই বহাল ছিলেন।

অমলেন্দু দে রচিত অসংখ্য গবেষণা গ্রন্থগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল 'খাকসার আন্দোলনের ইতিহাস'। এই গ্রন্থটির জন্যই তিনি ডি লিট উপাধি লাভ করেছিলেন। এছাড়াও রয়েছে 'রুটস্ অফ সেপারেটিজম ইন নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি বেঙ্গল', 'বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ', 'পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক', 'স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা প্রয়াস ও পরিণতি', 'গান্ধী-জিন্নাহ পত্রাবলী (সম্পাদনা)', 'ডারা সুকোলি এজ এন এক্সপোনেন্ট অফ কমুন্যাল হারমোনি (প্রবন্ধ)' ইত্যাদি। অধ্যাপনা-গবেষণা ছাড়াও অলঙ্কৃত করেছেন পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস ও এশিয়াটিক সোসাইটির গুরুত্বপূর্ণ পদ।

আজীবন তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ধারক ও বাহক। অন্যদিকে ভারত-চীন মৈত্রী সমিতির তিনি ছিলেন অন্যতম প্রাণপুরুষ—'চীনে ভারতীয় মেডিকেল মিশন', 'মাও চীনে আছেন' প্রভৃতি গ্রন্থ তার সাক্ষ্য বহন করছে। লেখালেখি করেছেন গুজরাটের গণহত্যা (২০০২) নিয়েও।

বামপন্থা ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে অবিচল ও চিরআস্থাবান—সাম্প্রদায়িক মৌলবাদের বিরুদ্ধে সদাজাগ্রত প্রহরী এই মানুষটির চলে যাওয়া বিশেষ করে আজকের পরিস্থিতিতে এক অপূরণীয় ক্ষতি বলেই গণ্য হবে। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

- অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত হলেন সাথী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়

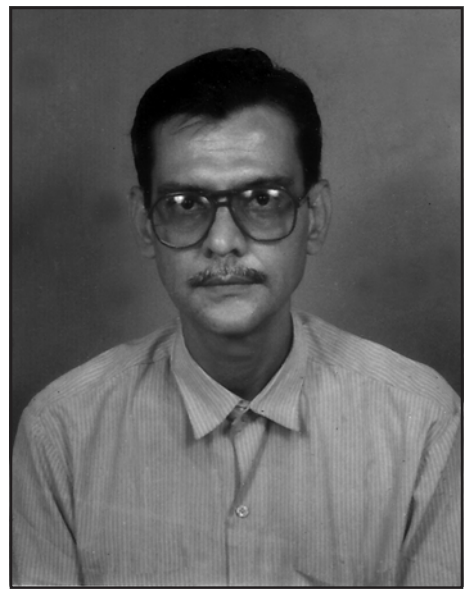

গত ২৮ মে (বুধবার), দীর্ঘ রোগভোগের পর হাওড়া জেলার বালীতে, নিজবাড়িতে দুপুর ২টায় মারা গেলেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। '৬৯-এর নকশালবাড়ী আন্দোলনের বাতাবরণে, ছাত্রাবস্থায় সংগ্রামী কার্যকলাপে নিজেকে যুক্ত করেন। তৎকালীন সরকারের পুলিশ তাকে কারারুদ্ধ করে। সি পি আই (এম এল)-এর সর্বক্ষণের এই কর্মী জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর নয়া গণতান্ত্রিক ফোরাম, গণফ্রন্টের কাজে যুক্ত হন। আই পি এফ গঠনের পূর্ব প্রক্রিয়া হিসাবে এগুলোকে দেখা যেতে পারে। বিজ্ঞান ক্লাব, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থার গান-নাটক-মুক্তমঞ্চে ধারাবাহিক নাটক সংঘটিত করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। বালীতে পার্টি শক্তির সামাজিকীকরণে এই কাজের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পার্টির গোপন অবস্থায় ''দেশব্রতী'' প্রচার থেকে শুরু করে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। বালীতে আই পি এফ-এও একইভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গণআন্দোলনের যে কোন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করতেন তিনি। উদাহরণ হিসাবে পৌরকর বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলনের কথা বলা যায়। বালী জুট মিলে ট্রেড ইউনিয়নের গঠন প্রক্রিয়ায় তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। পার্টির পক্ষে ২০০৫-এ বালী পৌরসভা নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন তিনি। সুবক্তা এই কমরেড শেষ জীবনে শারীরিক কারণে সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে নিজেকে যুক্ত রাখতে পারেননি। তার স্ত্রী ও দুই কন্যা সহ পরিবারবর্গকে বালী-বেলুড়ের পার্টি সমবেদনা জানায়।

কমরেড চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় অমর রহে!

... যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এল

চারের পাতার পর

রাজ্যগুলোতে দেখা দিতে শুরু করেছে। বিহারে নীতীশ কুমার পদত্যাগ করেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীত্বের ভার দিয়েছেন তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী ও সমাজ কল্যাণমন্ত্রী জিতন রাম মানঝির হাতে। আসামেও মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে বর্তমান সরকারগুলোর কাছে পরিবর্তিত রাজনৈতিক ভারসাম্যের মোকাবিলা যথেষ্ট কঠিন হয়ে উঠবে, আর বিহারে জে ডি (ইউ) এবং আর জে ডি-কে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে এসে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পুনর্বিন্যাস ঘটানোর প্রচেষ্টা চলছে বলে মনে হচ্ছে। মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড ও হরিয়ানায় এ বছরের শেষের দিকে নির্বাচন হওয়ার কথা এবং ঐ রাজ্যগুলোতে পরিস্থিতি বিজেপির অনুকূলে রয়েছে।

মোদী সংকট জর্জরিত ভারতীয় জনগণের কাছে 'সুদিন' আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই 'সুদিন' ঠিক কেমন হবে? মোদী এবারের রায়কে 'আশা ও বিশ্বাস'-এর রায় বলে বর্ণনা করেছেন এবং জনগণের প্রত্যাশা পূরণের জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মূল ধারার প্রচার ও সংবাদ মাধ্যমের অধিকাংশ সঞ্চালক, ভাষ্যকার ও কলম লেখক নেতা হিসাবে মোদীর বিশেষ গুণাবলী এবং ১৬ মে থেকে তাঁর ভাষণগুলোর মধ্যে 'সবাইকে নিয়ে চলা' ও 'নরমপন্থার ছোঁয়াচ'-এর আপাত লক্ষণগুলো নিয়ে প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হচ্ছেন। তবে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো, গ্রামীর দরিদ্রদের ব্যাপক অংশ, বেদখল ও উচ্ছেদের সম্ভাবনায় বিপন্ন জনগণ এবং ভারতের গণতন্ত্র ও ন্যায় সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নাগরিকগণের মধ্যে ভয় ও শঙ্কাও একইভাবে প্রকট হয়ে উঠছে।

মোদী সরকার যে 'সংখ্যাগুরুবাদী' সরকারের মতই আচরণ করবে এই আশঙ্কা অমূলক নয়। ব্যক্তি পূজা এবং স্বৈরাচারী ধারাই গুজরাটে মোদী মার্কা প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য হয়ে থেকেছে, যেখানে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে বা বাইরে যে কোন বিরোধী কণ্ঠস্বরকেই ধারাবাহিকভাবে দমন করা হয়েছে এবং এমনকি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়াও হয়েছে। এই আশঙ্কাও ভিত্তিহীন নয় যে, গুজরাটে রাষ্ট্রযন্ত্রকে যেভাবে অপব্যবহার করা হয়েছে তার সঙ্গে 'গুজরাট মডেল'-এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যকে যুক্ত করে জাতীয় স্তরেও এবার তার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর চেষ্টা হবে। যে সমস্ত কর্পোরেট ঘরানা মোদীর প্রচারে দুহাতে টাকা ঢেলেছে তারা দ্রুতই তার প্রতিদান চাইবে এবং মোদীর গুজরাটে যেমন দেখা গেছে সেই ধারায় আরও অবাধ কার্যকলাপ এবং দেশের প্রাকৃতিক ও আর্থিক সম্পদের ওপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ দাবি করবে। বিজেপিও এবার স্বীকার করেছে যে তার নির্বাচনী যন্ত্র পরিচালনায় আর এস এস বিরাট ভূমিকা পালন করেছে এবং তৃতীয় এন ডি এ সরকারের কার্যকলাপে সেই আর এস এস-এর ভূমিকাও ব্যাপকতর হবে।

সুপরিকল্পিত নাশকতা ও কৌশলবাজির সামনে ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কতটা মাত্রায় নিজের স্বাধীনতার আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারে তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কর্পোরেট সংবাদ ও প্রচার মাধ্যম ইতিমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছে যে, নিচু হতে বলার আগেই তারা হামাগুড়ি দিতে প্রস্তুত। জরুরী অবস্থার কালো দিনগুলোতে রাষ্ট্র সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমের ওপর সেন্সরসিপ চাপিয়ে দিয়েছিল, আর এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ''অদৃশ্য'' কর্পোরেট-নিয়ন্ত্রিত সুতোর টানে ''স্বআরোপিত সেন্সরসিপ''। তবে প্রতিষ্ঠান হোঁচট খেলেও ভারতীয় জনগণের সৃজনশীল উদ্যম এবং প্রবল প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর আমাদের আস্থা রাখতে হবে, এই জনগণই তো বন্ধন এবং সামরিক শৃঙ্খলা চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে সর্বদাই প্রতিরোধ করে এসেছেন এবং ভারতীয় রাষ্ট্রকে মোদীতন্ত্রে পরিণত করার যে কোন প্রচেষ্টাকে তাঁরা অবশ্যই পরাস্ত করবেন।

মোদী বাহিনীর বিজয়োল্লাস, সংবাদ মাধ্যমের ও 'উচ্চকাঙ্খী'-ঊর্ধ্বগামী মধ্যবিত্তদের বিপুল উচ্ছ্বাস আর ব্যাপক সংখ্যালঘু এবং বিভিন্নভাবে বিপদগ্রস্ত ও দুর্বল মানুষজনের গভীর শঙ্কা—এ সবই একান্ত বাস্তব ব্যাপার। এরকম এক চ্যালেঞ্জভরা পরিস্থিতির মুখে দাঁড়িয়ে বিপ্লবী কমিউনিস্টদের অবশ্যই স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে, বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ থেকে এবং সৃজনশীলভাবে জনগণকে তাঁদের বুনিয়াদি ইস্যুগুলোর ভিত্তিতে সমাবেশিত করতে হবে, তাঁদের মূল সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য সংগ্রাম চালাতে হবে।

... কলকাতায় কনভেনশন

একের পাতার পর

দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের প্রস্তুতিতে এই কনভেনশন রাজ্যের শ্রমিক শ্রেণীকে নিম্নে উল্লেখিত আশু কর্মসূচী সমূহে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে—(১) আগামী ১১ জুন বিকাল ৫টায় কলকাতায় কেন্দ্রীয় মিছিল ও দূরবর্তী জেলাগুলো যৌথভাবে মিছিল করা। (২) কনভেনশনে আলোচনার ভিত্তিতে আরও বিস্তৃত কর্মসূচী নেওয়া হবে।

সুবর্ণ বণিক হলে উক্ত কনভেনশনে এ আই সি সি টি ইউ-র তরফ থেকে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক বাসুদেব বসু। প্রস্তাবের সমর্থনে অন্যান্য বক্তারা হলেন সিটুর দীপক দাশগুপ্ত, এ আই টি ইউ সি-র রণজিৎ গুহ, এ আই ইউ টি ইউ সি-র দিলীপ ভট্টাচার্য, আই এন টি ইউ সি-র রমেন পাণ্ডে, ইউ টি ইউ সি-র বরুণ চৌধুরী, এইচ এম এস-এর সমীর রায় প্রমুখ।

ভ্রম সংশোধন

২২ মে সংখ্যার ২ পাতার ''নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণের পথে বাংলা'' লেখাটির ২য় কলমের ৩০ লাইনে ''... এবার তৃণমূলের ১০ শতাংশ''—এর পরিবর্তে পড়তে হবে ''... এবার তৃণমূলের ১ শতাংশ''।

২৯ মে সংখ্যার ১ম পাতায় ''হিন্দুস্তান মোটরসে সাসপেনশন'' খবর আসার পর ২৪ মে সকালেই প্রতিনিধিদল কারখানায় যান এবং এ দিনই সন্ধ্যেবেলায় প্রতিবাদ মিছিল করেন। রিপোর্টটিতে ২৫ মে বলা ছিল।

পড়ুন

চারু মজুমদার এবং তাঁর উত্তরাধিকার

মূল্য ঃ ৩০ টাকা

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করতে আহ্বান জানালো ধর্মতলার সভা

নিছক 'পোস্ট পোল ভায়োলেন্স' বা নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাস হিসাবে নয় আজ রাজ্যজুড়ে যা ঘটে চলেছে তা হল গণতন্ত্রের ওপর স্বৈরাচারী হামলা। বিগত ৩৪ মাস ধরে তৃণমূলী শাসনের ''প্রতিদিন প্রতিরাতে''-ই ধারাবাহিকভাবে বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমন করতে রাষ্ট্র এবং শাসক দলের পেশীশক্তির সম্মিলিত আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। নির্বাচনে 'ব্রুট মেজরিটি' শাসকের ঐ দমনকারী ভূমিকাকে আরও তীব্র করে তুলেছে। গ্রামে গঞ্জে গরিব মানুষের জীবন-জীবিকা আজ প্রবলভাবে আক্রান্ত। অপরদিকে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসীবাদী শক্তি জনসমর্থনের বলে বলীয়ান হয়ে তাদের ঘৃণ্য রাজনৈতিক খেলায় নেমে পড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির সম্মিলিত কণ্ঠস্বরে সি পি আই (এম এল) লিবারেশন তার আওয়াজ মেলাবে। এই লক্ষ্যেই গত ১ জুন ধর্মতলায় ''গণতন্ত্র বাঁচাও ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করো'' এই ব্যানারের ভিত্তিতে আয়োজিত সভায় পার্টির রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ বলেন, এই রাজ্যে একটা বিপদ ৩ বছর ধরে আমরা দেখছি, সম্প্রতি নতুন আরেকটা বিপদ গণতন্ত্রের সামনে চ্যালেঞ্জ হাজির করেছে। তৃণমূলী সন্ত্রাস কবলিত এলাকায় আক্রান্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, কামদুনিতে বিরোধী শক্তিকে ভোট দেওয়ার 'অপরাধে' হাজার হাজার টাকা জরিমানা জারি করছে শাসক দলের মাতব্বররা। পুলিশের কাছে এ ঘটনা তুলে ধরলে তারা বলছে তাদের কাছে নাকি কোন খবর নেই। আবার ঐ এলাকায় যেতে চাইলে তারা বলছে 'যাবেন না, পুলিশ নিরাপত্তা দিতে পারবে না'। এইভাবে প্রকাশ্য ও চাপা সন্ত্রাসে শাসক দল ও পুলিশ-প্রশাসনের এক অশুভ জোট কাজ করছে। বিজেপির একটি দল দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সন্ত্রাস এলাকায় পরিদর্শনে গেলেন। অথচ উত্তরপ্রদেশে মুজফফরনগরে যখন হাজার হাজার সংখ্যালঘু মানুষ আক্রান্ত, ত্রাণ শিবিরে পশুর মতো দিন কাটাচ্ছেন সেখানে ওরা যাননি। কাশ্মীরে হাজার হাজার যুবককে রাষ্ট্রীয় বাহিনী খুন করছে, 'আফস্পা' আইন বলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সেনাবাহিনী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কায়েম করেছে। সেটা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই, তারা ৩৭০ ধারা বিলোপের কথা তুলছে। আসলে দাঙ্গা ছাড়া এই দলটি বাঁচতে পারে না, নতুন করে এ রাজ্যেও তারা দাঙ্গা বাঁধানোর চক্রান্ত করছে। প্রধানমন্ত্রী শপথ অনুষ্ঠানে 'জয় শ্রীরাম ধ্বনি' নতুন করে ধর্মনিরপেক্ষতার সামনে এক অশনি সংকেত হাজির করেছে। তাই বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে একটু ঝুঁকি নিয়েই মানুষের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ধারাবাহিক প্রয়াস চালাতে হবে।

সভার শুরুতে সঞ্চালক প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক মইদুল হাসান বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সন্ত্রাস পরিদর্শনে গিয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় দল ঐ আক্রমণের ঘটনাকে ''মুসলিম গুণ্ডাদের দ্বারা দলিত ও আদিবাসীদের উপর আক্রমণ'' হিসাবে চিত্রিত করছে। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবেই তারা সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের চক্রান্ত করেছে।

সভার প্রধান উদ্যোক্তা রেজ্জাক মোল্লা বলেন, বড় বড় ভাষণ দেওয়ার অভ্যাস নেতাদের কাটাতে হবে, বামপন্থার পুনরুজ্জীবন ঘটাতে নীচে নেমে আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। গণতন্ত্র না থাকলে স্বৈরতন্ত্র আসবেই, সমস্ত শাসনকালেই এটা দেখা গেছে। তিনি তার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বলেন, ''ভেজাল বামপন্থী নেতৃত্বের'' জন্যই বামফ্রন্টের পতন ঘটেছে। তৃণমূল প্রথমে গণতন্ত্রের কথা বলেই ক্ষমতায় এসেছিল, আজ তাদের মধ্যেও 'ভেজাল' ঢুকে গেছে। হাজার হাজার মানুষের প্রতিরোধই স্বৈরাচারী শক্তি এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে। এই লক্ষ্যেই এগিয়ে যেতে হবে। ৩৭০ ধারা বিলোপের কথা বলে বিজেপি হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করার পথে দেশকে নিয়ে যেতে চায়। সি পি এম নেতৃত্বের পঙ্গুত্বের কারণে সংখ্যালঘুদের একটা অংশ বিজেপিতে যাচ্ছে স্রেফ বাঁচার তাগিদে। শরণার্থী, অনুপ্রবেশকারী ইত্যাদি কথা বলে বিজেপি তার ঘৃণ্য কৌশল গ্রহণ করছে; ঐ সমস্ত মানুষের নাগরিকত্বর দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সম্মিলিত জোট তৈরী করে মাঠে ময়দানে নামতে হবে।

দিল্লীর জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র নেতা প্রসেনজিৎ বসু বলেন, বিজেপির নির্বাচনী সাফল্য উন্নয়নের মডেল দেখিয়ে আসেনি, সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করেই এই জয় তারা পেয়েছে। এতদিন পশ্চিমবাংলায় দাঙ্গার রাজনীতি জমি পায়নি, এটাই বাংলার ঐতিহ্য। আজকের নতুন পরিস্থিতিতে একে রক্ষা করতে হবে। সভার উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে তিনি ঘোষণা করেন আগামী কিছুদিনের মধ্যেই এক কনভেনশনের মাধ্যমে বৃহত্তর বাম গণতান্ত্রিক শক্তির এক মঞ্চ গড়ে তোলা হবে। সি পি আই (এম) দলের নেতৃত্বের দিশাহীনতা, অসংলগ্ন কথাবার্তা তাদের ক্রমশই অকার্যকর করে তুলছে। তাই নীচুতলার প্রকৃত বামপন্থী শক্তিকে তিনি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পি ডি এস নেত্রী অনুরাধা পুততুণ্ড, সি পি এমের প্রাক্তন বিধায়ক সুমন্ত হীরা, সি পি আই (এম এল) রেডস্টারের শংকর চক্রবর্তী, ভাষা ও চেতনা সমিতির ইমানুল হক, জে এন ইউ-এর ছাত্র ডি এস এফের জিকো দাশগুপ্ত, সি পি বি-র বর্ণালী ব্যানার্জী; সুশোভন ধর প্রমুখ।

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
হিন্দি কেন্দ্রীয় মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

লোকযুদ্ধ

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ঃ ১৪০ টাকা

সি পি আই (এম এল)
কেন্দ্রীয় মুখপত্র (মাসিক)

''লিবারেশন''

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ১০০ টাকা

বিপ্লবী বামপন্থার বার্তাবহ

আজকের **দেশব্রতী** পড়ুন

ভোটের আগে চমক! বিদ্যুতের দাম কমানোর ঘোষণা! এখন আবার মাশুল বৃদ্ধির বাহানা!!

লোকসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যুতের মাশুল ইউনিট প্রতি ৫-১০ পয়সা কমানোর ঘোষণা করে 'চমক সৃষ্টি' করেছিলেন। বিধানসভায় তিনি বলেছিলেন ''যখন অন্যান্য রাজ্যে বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানো হচ্ছে তখন আমরা মাশুল কমাচ্ছি''। খবরের কাগজে হেডিং হলো ''মমতা কি আপের পথে চলেছেন!'' নির্বাচনী ডামাডোলে মানুষ কি ভুলে যাবে ঐ ঘোষণার সারবত্তা কতটা? আদৌ না! মূল্যবৃদ্ধির আঘাত মানুষকে নাজেহাল করে তুলেছে, বিদ্যুতের বর্ধিত বিল যার অন্যতম। সম্প্রতি ওয়াকিবহাল সূত্রে জানা গেল চলতি মাস অর্থাৎ জুন মাসেই বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির নয়া হার ঘোষণা করতে চলেছে এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন। কমিশনের কাছে বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী এবং গোয়েঙ্কাদের সি ই এস সি মাশুল বৃদ্ধির আর্জি জানিয়েছিল বিগত ১৯ ফেব্রুয়ারি। আইন অনুযায়ী ১২০ দিন অর্থাৎ ৪ মাস পরে নয়া মাশুল হার ঘোষণা বাধ্যতামূলক। ফলে চলতি জুন মাসের মাঝামাঝি সময়েই বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি ঘোষণা হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই সি ই এস সি-র চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কা জানিয়ে দিয়েছেন যে ইউনিট পিছু ১ টাকা ১০ পয়সা—অর্থাৎ বেশ চড়া হারেই মাশুল বাড়বে। এর কারণ, সংস্থার হলদিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে। ৩০০ মেগাওয়াটের মোট দুটি ইউনিট সেখানে তৈরী হচ্ছে। ব্যাঙ্ক, সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও শেয়ার হোল্ডারদের কাছ থেকে সংগৃহীত সিংহভাগ পুঁজি বিনিয়োগ করে গোয়েঙ্কারা নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরী করছে। সেই পুঁজিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচের বৃদ্ধি হিসেবে দেখিয়ে ওরা মাশুল বাড়াবে, বর্ধিত দামের বোঝা গ্রাহকদের উপর চাপিয়ে দেবে। বিদ্যুতের মতো জরুরী পরিষেবা ক্ষেত্রে একটি বেসরকারি কোম্পানী নিয়ন্ত্রণহীন মুনাফা করবে, আর মুখ্যমন্ত্রী তাকে নীরবে সমর্থন দেবেন! এই গোয়েঙ্কাদের সি ই এস সি ২০১২-১৩ সালে লাভ করেছে ৬০০ কোটি টাকারও বেশী! মুনাফার অঙ্কটা বেশ বড়।

তৃণমূলের জমানায় আটবার বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে। এম ভি সি এ (মান্থলি ভেরিয়েবল কস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট) নামক আইনি বিধির মাধ্যমে মাসে মাসে মাশুল বৃদ্ধির অধিকার বিদ্যুৎ কোম্পানীগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি (এন ডি এ) সরকার বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ চালু করেছিল। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারও কেন্দ্রীয় উদারীকরণ নীতিগুলোকে এ রাজ্যের বুকে ফলিত প্রয়োগ করেছিল। বিদ্যুৎ আইন যার অন্যতম। এর ফলশ্রুতিতেই মাসে মাসে ঘুরপথে বা ছদ্মপথে মাশুল বৃদ্ধির সেই ধারা তৃণমূলী শাসনেও অব্যাহত। বেসরকারি ফাটকা পুঁজির সাথে তৃণমূলের আঁতাত ক্রমশ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বাস্তবে রাজ্যের বিদ্যুৎ কোম্পানীগুলো প্রচুর মুনাফা করে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী একথা স্বীকার করে নিয়েই বললেন যে, সরকারি বিদ্যুৎ কোম্পানী ১৫০০ কোটি টাকা লাভ করেছে। বিদ্যুৎ বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা হিসাব করে বলেছেন, এতে ন্যূনতম ইউনিট পিছু ৬০-৬৫ পয়সা মাশুল কমার কথা। তাহলে রাজ্য বন্টন কোম্পানীর ক্ষেত্রে নিছক ৫-১০ পয়সা কমানোর কথা মুখ্যমন্ত্রী বললেন কেন? অন্যান্য রাজ্যের সাথে তুলনা করলেও বলা যায় এ রাজ্যে গড়ে বিদ্যুৎ মাশুল ৬ টাকা ৩৫ পয়সা, যা অনেক রাজ্যের থেকে বেশী। এ রাজ্যে সর্বনিম্ন ইউনিট প্রতি মূল্য হল ৪ টাকা ৬৭ পয়সা এবং সর্বোচ্চ ৮ টাকা ৩৬ পয়সা, যা দেশের কোথাও নেই। বি পি এল বা লাইফ লাইন গ্রাহকদের বিদ্যুতের দাম ইউনিটে ৩ টাকা ১৮ পয়সা ২৫ ইউনিট পর্যন্ত, বেশী খরচ করলে তাতে সাধারণ গ্রাহকদের জন্য নির্ধারিত দরই ধার্য হবে। এটাও দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ। কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুৎ মাশুল গড়ে ৪ টাকা ৫৭ পয়সা, যা অনেক রাজ্যের থেকে বেশী।

তথ্য

বর্তমানে তৃণমূল সরকার বিদ্যুৎ মাশুলে জনমুখী নীতি প্রণয়নের জন্য 'বিকল্প মডেলের' কথা বলছেন। বিদেশ থেকে কয়লা আমদানী কমিয়ে রাজ্যের নিজস্ব মালিকাধীন খনি থেকে কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে। এতে কয়লার গুণমান নাকি বজায় রাখা হবে। আসলে 'বেঙ্গল এমটা' নামক যৌথ মালিকাধীন সংস্থা এই কাজের বরাত পেয়েছে। এ জন্য কোন ওপেন টেণ্ডার ডাকা হয়নি। ঐ সংস্থাটি গোয়েঙ্কাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। সরকার নিজের খনি থেকে নিজেই কয়লা তোলার বদলে ঐ কোম্পানীকে 'লিজ' দিচ্ছে। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের 'কোল গেট দুর্নীতি' অর্থাৎ কয়লার ব্লক বন্টনে 'কাটমানি'-র কারসাজি আজ বহুল চর্চিত। দেখা যাচ্ছে তৃণমূল সরকারও ধীরে ধীরে সেই পথেরই পথিক হয়ে উঠছে।

কৃষিক্ষেত্রে কিছুদিন আগে বিগত বোরো মরশুমে বিভিন্ন জেলায় বকেয়া আদায়ে নির্বিচারে বিদ্যুতের লাইন কাটা হয়েছে। যা বামফ্রন্ট আমলের রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে গেছে। কৃষিক্ষেত্রে মিটার রিডিং প্রাইভেট এজেন্সির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে যারা রিডিং-এ কারচুপি করে নিজেদের কমিশন বাড়াতে কৃষকদের উপর অস্বাভাবিক বিলের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। অথচ ৪০০ কোটি টাকা ১৪ মাস ধরে বকেয়া রেখেছে কলকাতা পুরসভা। ত্রিফলা আলো লাগাতে আর্থিক দুর্নীতি তো হয়েছে, বড় কথা হল এতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে কলকাতা পুরসভার বিদ্যুতের বিল দ্বিগুণ করা হয়েছে। এভাবে মহানগরীকে আলো ঝলমল করা হয়েছে, অন্যদিকে গ্রামীণ কৃষিজীবীদের বিদ্যুতের প্রশ্নে চরম দুর্দশা সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন প্রবল খরায় কৃষি উৎপাদন কমে গেছে তখন চাষীরা চরম লোকসানে চাষাবাদ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এভাবে রাজ্যে সরকারি-বেসরকারি বিভাজন করে সৃষ্টি করে সরকার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরেই বৈষম্য চালু রেখেছে।

- জয়তু দেশমুখ

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
ইংরাজী সাপ্তাহিক ''আপডেট''
গ্রাহক মূল্য ঃ ৫০ টাকা

''আজকের দেশব্রতী'' সম্পাদকমণ্ডলী

অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী, জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত, সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ১.৫০ ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : deshabrati@gmail.com//cpimlwb@yahoo.com